মুসলিম নারীর সংগ্রাম সাধনা

মাওলানা শহীদুল ইসলাম মাজাহেরী

মুসলিম নারীর সংগ্রাম সাধনা

গ্রন্থনা
মাওলানা শহীদুল ইসলাম মাজাহেরী
শিক্ষক, আনন্দপুর দারুল উলূম মাদরাসা,
সাভার, ঢাকা।
খতীব, বায়তুল মামুর জামে মসজিদ,
সাভার, ঢাকা।

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

মুসলিম নারীর সংগ্রাম সাধনা

গ্রন্থনা — মাওলানা শহীদুল ইসলাম মাজাহেরী

সম্পাদনা — রাহনুমা সম্পাদনা বিভাগ

প্রথম প্রকাশ — সেপ্টেম্বর ২০১৪

প্রকাশনা সংখ্যা — ৩১

গ্রন্থস্বত্ব — রাহনুমা প্রকাশনী

প্রচ্ছদ — মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম

মুদ্রণ — ফারিয়া প্রিন্টিং প্রেস
৩/১, পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা ১১০০

একমাত্র পরিবেশক — রাহনুমা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ-০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১১৯৭-৩৯৭৩৩৯, ০১৯১৫-৪৬২৬০৮

মূল্য ঃ ১৫০.০০ (এক শ পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

MUSLIM NARIR SONGRAM SADHONA
Writer- Mawlana Shahidul Islam Mazaheri.
Market & Published by: Rahnuma Prokashoni. Price: Tk. 150.00, US $ 05.00 only.

ISBN 978-984-90618-6-1
E-mail: rahnumaprokashoni@gmail.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূমিকা

হামদ ও সালাতের পর, জিহাদ শব্দটি কর্ণগোচর হলেই কারও কারও মন ধাবিত হয় একমাত্র পুরুষদের দিকে। নারীদের উপরও যে জিহাদ ফরয এটা অনেকের ভাবনাতেই আসে না। অথচ কুরআন ও হাদীসে জিহাদের হুকুম থেকে নারীদেরকে বাদ দেয়া হয় নি। তবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে নারী-পুরুষের জিহাদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু স্থানে ভিন্নতা রয়েছে, তবে জিহাদ উভয়ের জন্যই ফরয।

অনেকে 'জিহাদ' শব্দের অর্থ না জানার কারণে বিভ্রান্তিতে পড়ে যান। আবার কেউ কেউ জিহাদের ইতিহাস ও ময়দানের সার্বিক হালত না জানার কারণেও বিভ্রান্ত হন। ইসলামের জন্য পুরুষেরা যেভাবে নিজেদের জান, মাল ব্যয় করেছেন, তেমনিভাবে মহিয়সী নারীরাও পিছিয়ে থাকেন নি। ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, প্রত্যেক যুগেই ইসলামকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে নারীর রক্তই প্রথম প্রবাহিত হয়েছে। জিহাদের নির্দেশ, তার ফল, কিতালের পদ্ধতি সম্পর্কে আধুনিক ও পুরাতন ইসলামী গ্রন্থ ভাণ্ডার ভরপুর। এগুলো শুধু পুরুষের জিহাদের বিবরণ দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, পুরুষের পাশাপাশি নারীদের জিহাদের পদ্ধতিও বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। কুরআনুল কারীমে যেসব স্থানে জিহাদ, মুজাহিদ, দীনের সাহায্য, শত্রু দমন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদির ফজিলত, গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা উল্লেখ রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়েই অন্তর্ভুক্ত। সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুদ্ধে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি সমভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। জ্ঞান, ইবাদত, বন্দেগী ও তারবিয়াত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ফতোয়া প্রদান, মোটকথা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। কিন্তু এসব কথা আজ অনেকেই ভুলে গেছেন।

খোদ নারীরাও তাদের পূর্বকালের মহিয়সী নারীদের ইতিহাস ভুলে গেছে। সেই সব সংগ্রামী নারীর কথা একত্রিত করার চেষ্টা করেছি আমি এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে।

নারীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কিভাবে সশরীরে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন এবং জিহাদের ময়দানে তাদের কাজ কী ছিল এবং সে দায়িত্ব তারা কিভাবে পালন করেছেন, তাছাড়া মুসলিম নারীর অতীত ভূমিকা ও সমকালীন নারীর করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

অধমের এই পাণ্ডুলিপিতে যখন আমার বন্ধুমহল উলামায়ে কিরামের নযর পড়ল, তখন তারা আমাকে উৎসাহিত করলেন ছাপানোর জন্য। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত বেশ দেরী হয়ে গেল। অবশেষে রাহনুমা প্রকাশনী কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় বইটি প্রকাশ করার কাজে হাত বাড়ালাম। আল্লাহ পাক সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

ভুল-ত্রুটি মুক্ত করে একটি বই পাঠকের হাতে তুলে দিতে লেখক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ আন্তরিকভাবেই চেষ্টা করেন। তারপরও ভুল থেকে যায়। কেননা আমরা মানুষ। আর মানুষ হিসেবে ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই কোনো ত্রুটি পাঠকের নজরে ধরা পড়লে মেহেরবাণী করে জানালে কৃতজ্ঞচিত্তে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের ব্যবস্থা করব। ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেন এ-ক্ষুদ্র খেদমতকে পরকালের নাজাতের অসীলা বানিয়ে দেন। আমীন।

–শহীদুল ইসলাম মাজাহেরী

উৎসর্গ–

অস্তিত্বের প্রতিটি কণা যাঁর কাছে
চিরঋণী...
আমার আব্বা।
তাঁর রূহের মাগফিরাতের জন্য।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

পৃথিবীকে সাজাতে মহান আল্লাহ বৈচিত্র্যময় অসংখ্য মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষ হল সে-সবের সেরা সৃষ্টি। মহান আল্লাহ পাক একজন পুরুষ ও একজন নারীর মাধ্যমে পৃথিবীতে মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নারীদের বাদ দিয়ে দুনিয়া বিনির্মাণের কথা চিন্তা করা যায় না। ধন্য সে আদমসন্তান, যে দুনিয়ায় আবির্ভূত হয়ে শ্রেষ্ঠত্বের খেতাবে ভূষিত হয়েছে। সর্বোচ্চ সম্মানে সমাসীন হয়েছে ইহকালে ও পরকালে। মানুষের মর্যাদা জীবনের ক্ষণে-ক্ষণে, কবরে-হাশরে, মিযানে, হাউজে কাউসারে, আল্লাহর জ্যোতিদর্শনের কাঙ্ক্ষিত লগ্নে।

পুরুষ সাহাবীদের মধ্যে যেমন শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করেছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর ফারুক, হযরত ওসমান গণী ও হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুম, একইভাবে নারীদের মাঝেও শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন হযরত খাদিজা, হযরত আয়েশা, হযরত আসমা, হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহুন্নার মতো পুণ্যাত্মা সাহাবীয়াগণ। শাহাদাতের পেয়ালা পিয়াসী যেমন ছিলেন হামযা, খুবাইব রাযি., তদ্রূপ ছিলেন সুমাইয়া, যায়নব, উম্মে রুম্মান রাযি.।

পার্থিব স্বার্থ বিলিয়ে দীনের মশাল প্রজ্বলিত করতে যেমন ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন আবু বকর, ওসমান, আবদুর রহমান বিন আউফ রাযি., অনুরূপ অংশগ্রহণ করেছেন হযরত খাদিজা, উম্মে আনাস রাযি. প্রমুখ। সে কারণে দীনের পরিমণ্ডলে পুরুষ-নারী উভয়ের ভূমিকা সমভাবে গ্রহণযোগ্য, প্রশংসনীয় এবং আল্লাহর দরবারে বিনিময়োপযুক্ত। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকেই একধাপ এগিয়ে দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তাকে কাজে অংশগ্রহণ ছাড়াই কর্মসম্পাদনকারী পুরুষের সমান প্রতিদান প্রদান করেছে।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে নারী যুদ্ধের জন্য তার স্বামীকে পাঠিয়ে দেয় এবং নিজের সতীত্ব সংরক্ষণ

করে, ঘরের যাবতীয় মালামালের রক্ষণাবেক্ষণে অবতীর্ণ হয়, সে নারী পুরুষের পাঁচ শ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সত্তর হাজার ফেরেশতা তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে হূরদের নেত্রী ঘোষণা দেবে। তারপর সে বেহেশতের পবিত্র পানিতে গোসল করে নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে ইয়াকুতের ঘোড়ায় চড়ে প্রিয় স্বামীর অপেক্ষায় কালক্ষেপণ করবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থ- যে ব্যক্তি- পুরুষ হোক বা নারী, কোনো সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব। প্রতিদানে তাদের উত্তম কাজের কারণে তাদেরকে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত। –সূরা নাহল-৯৭

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ধর্মীয় সাফল্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর দৃষ্টিতে নারী জাতি পুরুষের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। অনেক ক্ষেত্রেই তারা স্বল্প আমলের বিনিময়ে জান্নাতের সুসংবাদ শুনতে পায়।

এখানে বিভিন্ন যুগে ইসলাম ও জিহাদের ময়দানে মহীয়সী নারীগণের অংশগ্রহণের কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা তুলে ধরা হল।

চির বিপ্লবী নারী উম্মে উমারা রাযি.

প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতপূর্ণ আদর্শ নিকেতন বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছিল এমনসব পুণ্যপ্রাণ সঙ্গীদের উপস্থিতিতে, যাঁরা আল্লাহর সঙ্গে কৃতঅঙ্গীকার হরফে-হরফে বাস্তবায়ন করেছিলেন। তাঁরা জীবনের সবকিছুর উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন আল্লাহর দীন আর প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোকিত আদর্শকে। ক্ষণজন্মা ভাগ্যবান সেইসব মহৎপ্রাণ ব্যক্তির অন্যতম হলেন হযরত উম্মে উমারা রাযিয়াল্লাহু আনহা। প্রকৃত নাম নাসিবা বিনতে কা'ব ইবনে আমর রাযি.। খাযরাজ বংশের এই মহীয়সী প্রিয় নবীর মাদানী সাহাবীগণের অন্যতম।

তাঁর ভাইয়ের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব আলমাযানী রাযি. বদর যুদ্ধে শরিক হয়েছিলেন। যুদ্ধ করেছিলেন ইসলামের পক্ষে। অবশেষে তিনি

মদীনায়ই ইনতেকাল করেন। তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন হযরত ওসমান রাযি.। তার দ্বিতীয় ভাই হযরত আবদুর রহমান বিন কা'ব রাযি.। তিনি সামানপত্রের অভাবে তাবুকযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি বলে কেঁদে-কেঁদে একদম ভেঙে পড়েছিলেন। তখন তাঁর এবং তাঁর মতো সামর্থ্যহীন অক্ষম ঈমানদারদের সান্ত্বনাস্বরূপ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ .

অর্থ- তারা অর্থব্যয়ে অসামর্থ্যজনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরে গেল।

–সূরা তাওবা-৯২

এতে সহজেই বোঝা যায় যে, হযরত উম্মে উমারা রাযি.-এর জন্ম হয়েছিল এক ভাগ্যবান আলোকোজ্জ্বল পরিবারে।

উম্মে উমারার প্রথম বিয়ে হয়েছিল যায়েদ ইবনে আসেম এর সঙ্গে। হযরত যায়েদ ইবনে আসেম ইবনে কা'ব ইবনে মুনজির আল আনসারিও ছিলেন একজন সুবিখ্যাত সাহাবী। ইসলামের প্রথম সারির সৈনিক। এই মহান সাহাবী উপস্থিত ছিলেন বাইয়াতে আকাবার ঐতিহাসিক বৈঠকে। তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন বদরযুদ্ধে। অহুদযুদ্ধেও শরিক ছিলেন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে। অবশ্য তাঁর সঙ্গে উম্মে উমারার বিয়ে হয়েছিল ইসলামের পূর্বকালে। তাঁর ঘরে হাবীব ও আবদুল্লাহ নামে দুজন পুত্রসন্তান ছিল, তাঁরাও প্রিয় নবীর সম্মানিত সাহাবী রাযি.।

হযরত যায়েদের পর তিনি বিয়ে করেন গাযওয়া ইবনে আমর ইবনে আতিয়াকে। তিনিও ছিলেন একজন আনসারি সাহাবী। তাঁর এই সংসারে দুই সন্তান – যারাহ ও তামিম। তাঁরাও ইসলামের প্রথমকালের মুসলমান। তাঁরাও শরিক ছিলেন আকাবার বাইয়াতে এবং অহুদের যুদ্ধে।

কিন্তু হযরত উম্মে উমারার সবচেয়ে বড় গর্বের বিষয় অন্য জায়গায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর মুসায়লামা দাবি করে নবুয়তের। এ নিয়ে সৃষ্টি হয় মহা তোলপাড়। প্রায় চল্লিশ হাজার যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে মুসায়লামা অবতীর্ণ হয় যুদ্ধে। বীর সেনাপতি খালেদ বিন ওলিদের নেতৃত্বে অগ্রসর হন মুসলিমযোদ্ধাগণ। সজ্ঘাত হয় প্রচণ্ড। প্রায় সত্তরজন হাফেজে কুরআন সাহাবী এ-যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। অবশেষে হযরত খালিদ বিন ওলিদ রাযি. মুসায়লামাকে সম্মুখ লড়াইয়ের আহ্বান জানালেন।

সে তার 'হাদিকাতুর রাহমান' নামক বাগিচায় গিয়ে আত্মগোপন করে। চারদিক থেকে প্রাচীর ঘেরা এই বাগানে আশ্রয় নেওয়ার পর প্রহরীরা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। তখন সাহাবী হযরত বারা ইবনে মালিক রাযি. সঙ্গিগণকে বলেন, তোমরা আমাকে ধরে দেয়ালের উপর ছুড়ে মার। জানবাজ বন্ধুগণ তাই করলেন। এই দুঃসাহসী সাহাবী উড়ে গিয়ে বাগানে পড়তেই এগিয়ে এল বাগানের প্রহরী।

প্রবল রোষে দীপ্ত বারা রাযি. অবুঝ শিশুকে কাবু করার মতো প্রহরীদেরকে পদতলে ফেলে ছুটে যান ফটকের দিকে। ফটক মুক্ত করে দিতেই এগিয়ে আসে মুসায়লামা। কিন্তু মিছে লুকোবার চেষ্টা করে মিথ্যুক মুসায়লামা। হযরত উম্মে উমারার পুত্র আবদুল্লাহ রাযি. এবং হামযা রাযি.-এর ঘাতক হযরত ওয়াহশী[১] রাযি. ধরে ফেললেন মুসায়লামাকে। নাঙ্গা তলোয়ারের প্রচণ্ড আঘাতে কুপোকাত করে ফেললেন হযরত আবদুল্লাহ রাযি.। সেই সঙ্গে বর্শা দ্বারা আঘাত করেন হযরত ওয়াহশীও। এরপর খোদার দুশমন নবীজির চিরশত্রু মুহূর্তে দুনিয়া ছাড়া। নবুয়াতের জঘণ্য দুশমন মুসায়লামাকে হত্যা করার কৃতিত্ব যে মহান মুজাহিদের, তারই গর্বিত জননী হযরত উম্মে উমারা রাযি.।

দ্বিতীয় পুত্র হাবিব ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম শরিক ছিলেন আকাবার শপথবৈঠকে। নবীজির হয়ে যুদ্ধ করেছেন ওহুদ ও খন্দকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পার্থিব জীবনের শেষ সোপানে উপনীত। মিথ্যাবাদী মুসায়লামার পক্ষ থেকে চিঠি এল। তার দাবি- সেও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো নবী। তবে পুরো দুনিয়ার নয়। আধা পৃথিবীর। বাকিটার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর পাঠালেন এভাবে-

> বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
>
> মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে মুসায়লামা কায্যাবের নামে। সত্যপথ অনুসারীর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।
>
> পরকথা, সারা পৃথিবীর মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি যাকে

---

১. ওয়াহশী রাযি. ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত হামযা রাযি.-কে হত্যা করেছিলেন।

চান, তাকেই তাঁর কর্তৃত্ব দান করেন। আর উত্তম পরিণাম আল্লাহভীরুদের জন্য।

হেদায়েতের এই প্রদীপ্ত আহ্বান পৌছার পরও তার টনক নড়ে নি। আলোর পথে ফিরে আসে নি। তার গোমরাহির মাত্রা আরও বেড়ে যায়। অবশেষে বাধ্য হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নামে আরেকটি পত্র লিখেন এবং এই পত্রের দূত নির্বাচিত হন হযরত উমারার দ্বিতীয় পুত্র হাবীব। প্রিয় নবীজির বাণী নিয়ে তিনি পৌছে যান ভণ্ড মুসায়লামার আস্তানায়। চিঠি পেয়ে মুসায়লামা জ্বলে ওঠে চামচিকা যেভাবে জ্বলে ওঠে আলো দেখলে। বন্দি করে আল্লাহর রাসূলের দূত হযরত হাবীব রাযি.-কে। নির্যাতন চলে অবিরাম। আঘাতে-আঘাতে তিনি ক্লান্ত। তখন মুসায়লামা ভাবে এবার বোধহয় কাবু হয়ে গেছে হাবীব। বিরাট সমাবেশ ডাকে মুসায়লামা কায্যাব। বিশাল জনতার ভিড় ঠেলে ডেকে আনে হযরত হাবীবকে। সামনে আসতেই মুসায়লামা জিজ্ঞেস করে-

– তুমি কি বিশ্বাস কর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল?

–হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

–তুমি কি বিশ্বাস কর আমি আল্লাহর রাসূল?

মুসায়লামার মুখ তখন রাগে রোষে বিবর্ণ। শরীর কাঁপছে। আর হযরত হাবিব রাযি. উপহাসের স্বরে বললেন,

–আমি শুনতে পাচ্ছি না। কথাটি এভাবে কয়েকবার আওড়াবার পর তো মুসায়লামার মাথায় খুনের রক্ত চেপে গেল। চিৎকার করে ডেকে পাঠাল জল্লাদকে। আদেশ করল, একে জীবন্ত কেটে টুকরো-টুকরো করো। আদেশ পালিত হল নির্মমভাবে। প্রিয় নবীর প্রিয় সাহাবীর এক একটি অঙ্গ কেটে-কেটে আলাদা করা হল। মর্দে মুজাহিদ দৃঢ় বিশ্বাস, অসীম জজবা আর তরঙ্গায়িত নবীপ্রেমের শাশ্বত উপমা স্থাপন করে গেলেন নিজ জীবনকে তিলে-তিলে বিলিয়ে দিয়ে। তাঁর শাহাদাতের সংবাদে বেদনাভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আর জননী উম্মে উমারা! এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর নির্মম ঘটনা শুনে ক্ষোভে শোকে বোবা বনে যান। শপথ করে বলেন, আমি এর প্রতিশোধ নেব। কুদরতের কি বিস্ময়কর লীলা। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, অবশেষে হযরত

আবু বকর রাযি.-এর শাসনামলে হযরত খালিদ বিন ওলিদ রাযি. এর নেতৃত্বে যখন মুসায়লামার উপর হামলা হয়, তখন মুসায়মালাকে হত্যা করেন এই হাবিবের সহোদর হযরত আবদুল্লাহ রাযি.। সঙ্গে ছিলেন হযরত ওয়াহশী রাযি.। শুধু কি তাই! হযরত উম্মে উমারা রাযি. নিজেও শরিক হয়েছিলেন হক-বাতিলের এই ঐতিহাসিক যুদ্ধে। সে কি রুদ্ররূপ জননী! ডান হাতে নাঙ্গা তলোয়ার আর বাম হাতে বর্শা। মুসায়লামার যখন পতন হল, তখন তাঁর চোখেমুখে আনন্দের ঝিলিক। চিৎকার করে বলে উঠেন, আল্লাহর দুশমন মুসায়লামা কোথায়? অথচ তাঁর শরীর তখন বিক্ষত। ঝরে পড়ছে তাজা রক্ত। আর মুসায়লামার পতিত মুখে তিনি দেখছেন তাঁর শহীদ পুত্রের বিজয়ী মুখ। হযরত উম্মে উমারা রাযি. এর বাইয়াতে আকাবায় শরিক হবার ঘটনাটিও বেশ চমৎকার। তিনি নিজেই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন এভাবে-

বাইয়াতে আকাবার রজনীতে আমিও উপস্থিত ছিলাম এবং বাইয়াতও নিয়েছিলাম অন্য সকলের সঙ্গে। সেটা এভাবে, পুরুষগণ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করলেন। হযরত আব্বাস রাযি. তখন নবীজির হাত ধরে আছেন। বাইয়াতপর্ব সমাপ্ত হবার পর দেখা গেল আমি আর উম্মে হানি বাকি। তখন আমার স্বামী আযয়াহ বিন আমর রাযি. নবীজির খেদমতে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই দুজন নারীও আমাদের সঙ্গে এসেছে। তারাও বাইয়াত গ্রহণ করতে চায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমাদেরকে যেসব বিষয়ে বাইয়াত করেছি, তাদেরও সেসব বিষয়ে বাইয়াত করে নিলাম। আর আমি মেয়েদের সঙ্গে হাত মেলাই না।

উল্লেখ্য, বাইয়াতে আকাবার এই দ্বিতীয় শপথ-অনুষ্ঠানটি সঙ্ঘটিত হয়েছিল নবুওয়াতের ত্রয়োদশ সালে। সত্তরজনের বেশি পুরুষ আর ভাগ্যবতী এই দুই নারী অংশগ্রহণ করেছিলেন এই ঐতিহাসিক শপথ-অনুষ্ঠানে। সুখে-দুঃখে, কালে-অকালে সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য বিসর্জন ও বিপ্লবের বুনিয়াদি উৎস এবং পরবর্তীকালের বিস্ময়, ইসলাম ও উম্মাহ সেই বাইয়াতে আকাবারই উত্তম ফসল। উম্মে উমারার আরেকটি ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হল, তিনি ইসলামী বিপ্লব ও চেতানাদীপ্ত বাইয়াতুর রিদওয়ানেও শরিক ছিলেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন, তিনি বায়তুল্লায়

প্রবেশ করেছেন মাথা মুণ্ডানো অবস্থায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নের কথা সাহাবীগণকে জানালেন। শুনে সকলেই দারুণ খুশি! নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানালেন, তিনি শিগগিরই উমরা করতে যাবেন। এ-কথা ছড়িয়ে পড়লে এক হাজার চার শ সাহাবীর বিশাল কাফেলা প্রস্তুত হয়ে গেল। তাদের মধ্যে চারজন-মাত্র নারী। সেই চারজন হলেন নবীজির জীবনসঙ্গিনী হযরত উম্মে সালামা রাযি. এবং উম্মে উমারা, উম্মে হানি ও উম্মে আমির রাযি.। কিন্তু কুরাইশরা পথে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে জ্বলে উঠে যুদ্ধের লেলিহান শিখা। সে এক কঠিন মুহূর্ত।

এ-মর্মে হযরত উম্মে উমারার বর্ণনা শোনা যাক। তিনি বলেন, একদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তাঁবুতে এলেন। তখন হঠাৎ করে সংবাদ এল, হযরত ওসমান রাযি.-কে কুরাইশরা শহীদ করে দিয়েছে। তখন তিনি আমাদের তাঁবুতে বসে বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে বাইয়াত গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন। তখন বাইয়াত গ্রহণের জন্য মানুষের ঢল নামল এবং আমাদের সামানপত্র মাড়িয়ে একেবারে শেষ। আর মুসলমানগণ রণসাজে সজ্জিত। অথচ আমরা বের হয়েছিলাম উমরা করতে। আমাদের হাতে অস্ত্র বলতে তেমন কিছুই নেই। আমার হাতে একটি শাণিত তলোয়ার ছিল। আমি সেটা নিয়ে একটি খুটির কাছে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বলে দিলাম, যদি কোনো বেঈমান আমার কাছে আসে, তা হলে তাকে হত্যা করে ছাড়ব। হিজরি ষষ্ঠ সালে অনুষ্ঠিত বৃক্ষতলায় সম্পাদিত এই শপথকে বাইয়াতুর রিদওয়ান বলা হয়। এই বাইয়াত-অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন, তাঁদের একজনও জাহান্নামে যাবে না। সুসংবাদের আলোয় উদ্ভাসিত এই ভাগ্যবানদের অন্যতম হযরত উম্মে উমারা রাযি.-এর মর্যাদাও ছিল ঈর্ষণীয়। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে লক্ষ করে বলেছিলেন, 'উম্মে উমারা, তুমি যা পার তা আর কে পারবে?'

তাই এই ভাগ্যবতী নারী যখন ইয়ামামার যুদ্ধে মুসায়লামার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন, তখন তার সেবায় এগিয়ে যান খোদ সেনাপতি খালিদ বিন ওলিদ এবং শুশ্রূষা সম্পর্কে অভিজ্ঞজনদেরকে তাঁর সেবায় নিযুক্ত করেন। খলীফা হযরত আবু বকর ও উমর রাযি. তাঁর যত্ন নিতেন যথাসাধ্য। অবশেষে প্রিয় নবীর নিখাদ ভক্ত, আল্লাহর দীনের একনিষ্ঠ

সেবিকা, নববী আদর্শের আপোষহীন পতাকাবাহী এই মহীয়সী হিজরী ১৩ সালে স্বীয় প্রভুর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় নেন। চিরনিদ্রায় শায়িত হন জান্নাতুল বাকিতে। রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা।

হযরত খানসা রাযি.-এর বীরত্ব

আমিরুল মুমিনীন খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাযি. এর শাসনামল। খলীফার পক্ষ থেকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো হল সেই যুগের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রনায়ক পারস্য সম্রাটের কাছে। তিনি ইসলামের মহান দূতকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন।

পারস্য সম্রাট রাগে-ক্ষোভে উত্তেজিত হয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করে মুসলমানদের অস্তিত্ব মুছে ফেলার লক্ষ্যে, যেন অতীতের সকল যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মহাবীর রুস্তমকে সেনাপতি করে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যের সুসজ্জিত এক বিশাল বাহিনী কাদেসিয়ার প্রান্তরে প্রেরণ করেন। পারস্য সম্রাটের এই হিংস্র সিদ্ধান্তের সংবাদ পেয়ে আমিরুল মুমিনীন খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.-এর নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার মুসলিম সৈন্যের একটি দল ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৬ হিজরীতে তাদের মোকাবেলার জন্য কাদেসিয়ায় পাঠান। এই যুদ্ধে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.-এর নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনীর হাতে পারস্য সম্রাটের বিশাল বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। মহাবীর রুস্তম নিহত হয়। মুসলমানদের ঈমানি পরীক্ষার এই কঠিন জিহাদে অংশগ্রহণ করেন মহিলা সাহাবী হযরত খানসা বিনতে আমর ইবনুশ শারিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা। এ নামেই তাঁকে ডাকা হত এবং এ নামেই তিনি ইতিহাসের সোনালি পাতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

খানসা মানে হরিণী। তিনি ছিলেন নজদের অধিবাসী। তার পিতার নাম আমর ইবনুশ শারিদ। তিনি কায়েস গোত্রের সল্‌ম খান্দানে জন্মগ্রহণ করেন। সল্‌ম খান্দানের রাওয়াহা ইবনে আবদুল আজিজ সালামার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু তাঁর এই বৈবাহিক জীবন বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। স্বামী যুবক রাওয়াহা অল্প বয়সে মারা যায়। পরে মুরশাদ ইবনে আবু আমের নামে আরেক যুবকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। সেই যুগের আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা

কবি হিসেবে তাঁর ছিল বিশেষ খ্যাতি। তাঁর কবিত্বের প্রশংসা করে 'উসদুল গাবা' গ্রন্থের রচয়িতা লিখেছেন, সকল কাব্যরসিক এই ব্যাপারে একমত যে, খানসার আগে বা পরে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো মহিলা কবির জন্ম হয় নি। উমাইয়া যুগের প্রসিদ্ধ কবি জারিরকে জিজ্ঞাসা করা হল, এ-যুগের সবচেয়ে বড় কবি কে? জবাবে তিনি বলেন, খানসা না হলে আমি হতাম।

মক্কার আকাশে রিসালাতের সূর্য উদিত হয়ে চারদিক আলোর আভা বিকিরণ করলে হযরত খানসার চক্ষু আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পরিবারের আরও কয়েক সদস্যের সঙ্গে রাহমাতুল্লিল আলামীন দীর্ঘক্ষণ তাঁর কবিতা শোনেন। তার কাব্যপ্রতিভায় বিমুগ্ধ ও বিমোহিত হন। কাব্যের সেই উৎকর্ষের যুগে শতাধিক মহিলা কবির নাম শোনা যায়। তাদের মধ্যে খানসা ছিলেন সবার শীর্ষে।

এ-যুদ্ধে হযরত খানসা একা অংশ নেন নি। তিনি তাঁর চার পুত্রসন্তান নিয়ে ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধে যাবার আগের রাতে তিনি তাঁর বংশীয় ঐতিহ্য তুলে ধরে ছেলেদের উদ্দেশে মর্মস্পর্শী এক ভাষণ দান করেন। তার এ-ভাষণের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর পুত্রদেরকে বীরের বেশে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করা। তিনি বললেন,

আমার প্রিয় সন্তানেরা! তোমরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছ। স্বেচ্ছায় হিজরত করেছ। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা যেমনি আমার গর্ভের ধন, ঠিক তেমনি তোমার পিতার সৎ-সন্তান। আমি তোমাদের পিতার সঙ্গে প্রতারণা করি নি। তোমাদের মাতুল-গোত্রকেও লাঞ্ছিত করি নি। তোমাদের বংশধারা নিষ্কলঙ্ক। তোমরা জান, কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মধ্যে মুসলমানদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট পুরস্কার। এ অস্থায়ী জীবন তুচ্ছ, নগণ্য, আখেরাত হল আমাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান।

এরপর জিহাদের ময়দানে অবিচল থাকার জন্য তিনি তাঁর সন্তানদের কুরআনে করীমের একটি আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থ- হে মুসলমানগণ, তোমরা ধৈর্যধারণ কর, অপরকে ধৈর্যের তালিম দাও এবং সকলে ঐক্যবদ্ধ থাক, আর আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভে সামর্থ হবে। –সূরা আ-লে ইমরান : ২০০

হে আমার কলিজার টুকরো সন্তানেরা! তোমরা যখন দেখবে, তীব্র যুদ্ধ শুরু হয়েছে, যুদ্ধে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে আর তার স্ফুলিঙ্গ চারদিকে চিকচিক করছে, তখন তোমরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশা করবে। ইনশাআল্লাহ, পরকালের কামিয়াবি লাভে অবশ্যই তোমরা সফলকাম হবে।

মায়ের উপদেশ অনুযায়ী ইসলামের সৈনিকেরা প্রত্যেক্ষ রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ইতিহাসের পাতায় শৌর্য-বীর্য আর সাহসিকতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। শেষ পর্যন্ত একে একে সকলে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে।

জননী হযরত খানসার কাছে চার সন্তানের শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছলে, এই বীরমাতা কলিজার টুকরো সন্তানদের জন্য একটুও আফসোস, অনুতাপ, দুঃখ না করে বরং আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলেন এবং আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন- চার শহীদের মা হবার সৌভাগ্য ও মর্যাদা যিনি দিয়েছেন সেই মহান আল্লাহর নিকট আমার প্রত্যাশা, আমি তাঁর রহমতের ছায়ায় আমার সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হতে চাই।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে এমন আরও অনেক বীরাঙ্গনা জননীর কাহিনী পাওয়া যাবে, যাঁরা দীনের জন্য তাদের জান, মাল এবং তাদের কলিজা-ছেঁড়া ধনকে পর্যন্ত কুরবানি করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। কিন্তু আফসোস, বর্তমান বিশ্বের যে করুণ অবস্থা, যে দিকেই কান পাতি শুধু মুসলমানদের হাহাকার আর আর্তনাদ ছাড়া কিছুই শোনা যায় না। উম্মাহর এই করুণ মুহূর্তে তাঁর মতো বীরমাতাদের বড়ই প্রয়োজন, যাঁরা তাঁদের সন্তানদের নিয়ে যোগদান করবে জিহাদের ময়দানে।

হযরত আসমা বিনতে জিয়াদ রাযি.-এর বীরত্ব

রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস। আগের সেই আনন্দ আর নেই। ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা একফালি হাসি আর দেখা যায় না। হৃদয়তন্ত্রিতে আহ্লাদের সুরমূর্ছনা এখন ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে না। চোখের তারায় এখন আর স্বপ্নরাজ্যের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে না। সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো লাগছে তার।

নিঝুম রাতে রাজপ্রাসাদের সুকোমল বিছানায় গা এলিয়ে দিলেই রাজ্যের চিন্তা জমা হয় মাথায়। এলোমেলো দুশ্চিন্তা এসে ভিড় করে চেতনায়। নিঃস্ব আরব বেদুইনেরা এতো সাহস, এতো শক্তি পেল কোথায়। মানছে না কোনো

বাঁধা। যেদিকে যাচ্ছে মরু সাইমুমের মতো সবকিছু তছনছ করে ফেলছে। বাধভাঙা জোয়ারের ন্যায় ধেয়ে আসছে। সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে ঝড়ো গতিতে। আকাশের বিজলিও যেন তাদের তরবারির কাছে হার মেনে গেছে। কোনো শক্তিই তাদের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। বুঝতে পারছে না তাঁদের বিজয়কে। বিপুল শক্তির অধিকারী রোমান সৈন্য পর্যন্ত ব্যর্থ হল এই আরব বেদুইনদের কাছে। না, সহ্য করা যায় না আর। দ্রুত ব্যবস্থা একটা নিতেই হবে। দাঁতভাঙা জবাব দিতে হবে ওদের। তাদের শক্তি, সাহস, হিম্মত, একেবারে ভেঙে দিতে হবে। বিজয়ের সাধ চিরতরে মিটিয়ে দেব তাদের। চিন্তা করতে লাগল সম্রাট হেরাক্লিয়াস। কিন্তু কিভাবে? কোন্ পদ্ধতিতে তা সম্ভব?

না, এভাবে আক্রমণ করে তাঁদের রোখা যাবে না। এবার কৌশলে কিছুটা পরিবর্তন করতে হবে। শুধু রোমান বাহিনীকে দিয়ে হবে না। খ্রিস্টধর্মের নামে যুদ্ধের ডাক দিতে হবে। উসকে দিতে হবে সকল পাদরিকে। সমগ্রজাতির ধর্মীয় চেতনায় আগুন জ্বালিয়ে দিতে হবে। ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জীবন দিতে ছুটে আসবে সবাই। হ্যাঁ, এবার সাফল্য আসবেই। পেছনের চূড়ান্ত প্রতিশোধ এবার নিতেই হবে।

সম্রাট হেরাক্লিয়াস তার পরিকল্পনায় পূর্ণ সফলকাম। দারুণ সাড়া পাওয়া গেল এতে। পুরো রোমান সাম্রাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেল। বাড়তে-বাড়তে তাদের সেনা সংখ্যা আট লাখে পৌঁছে গেল।

বিশাল এই বাহিনী সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। আত্মগৌরব, দাপট ও অহঙ্কারে টইটুম্বুর তাদের হৃদয়। দারুণ ছন্দে আছে তারা। অবয়বে জিঘাংসার নিদর্শন স্পষ্ট।

মুজাহিদ বাহিনী তখন হিমসে অবস্থান করছে। বিশাল বাহিনীর সংবাদ পেয়ে গেল তারা। সেনাপতি খালেদ বিন ওলিদ ভাবনায় পড়ে গেলেন। এই মুষ্টিমেয় মুজাহিদ নিয়ে এতো বিশাল বাহিনীর কিভাবে মোকাবেলা করা যায়? কোন্ পন্থা অবলম্বন করব এখন!

হযরত খালেদ বিন ওলিদ রাযি. পরামর্শ করলেন, এই বিশালবাহিনীর মোকাবেলার জন্য হিমস উপযুক্ত স্থান নয়। এর জন্য দরকার বিশাল প্রান্তর। প্রশস্ত মাঠ। তাই ইয়ারমুকের প্রান্তরই সবার পছন্দ হল।

ফয়সালা অনুযায়ী মুজাহিদ বাহিনী ইয়ারমুকের দিকে প্রত্যাবর্তন করল।

মাত্র পঁয়ত্রিশ হাজার মুসলিম ফৌজ। অপরদিকে আট লক্ষ খ্রিস্টান। কিন্তু মুসলমানরা তো অস্ত্র আর সেনাবলে লড়ে না। আল্লাহর সাহায্যই মুসলমানদের প্রধান শক্তি। দীর্ঘ ছয় মাইলজুড়ে খ্রিস্টানবাহিনীর অবস্থান। ছাউনির পর ছাউনি। যেন এর শেষ নেই। বিভিন্ন অঞ্চলের যোদ্ধারা এতে অংশ নিয়েছে। এমনকি আরব সর্দার যাবালা ইবনে আইহাম দুর্ধর্ষ যাট হাজার আরব সেনা নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

এতদসত্ত্বেও হেরাক্লিয়াসের অভিপ্রায় ছিল যথাসম্ভব যুদ্ধ এড়িয়ে চলা। সন্ধি করার চেষ্টাই বেশি করতে হবে। কিন্তু কোনো ফল হল না। যুদ্ধ বেঁধে গেল। ভয়াবহ পরিস্থিতি। মরণপণ যুদ্ধ। চলছে তো চলছেই। পাঁচ দিন যুদ্ধ চলল।

যুদ্ধের তৃতীয় দিনটি ছিল বেশি ভয়াবহ। অত্যন্ত ভয়ানক। সেদিন রোমান বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল মুসলিম জানবাজদের জন্য। বার-বার মুজাহিদগণ পিছু হটছিল। মুসলিম রমণীরা তাঁদের তিরস্কার ও উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে আবার ময়দানে পাঠাচ্ছিল। আবু সুফিয়ানকে পিছু হটতে দেখে হিন্দা বললেন, আবু সুফিয়ান কোথায় যাচ্ছ? ফিরে যাও। জীবন উৎসর্গ করে দাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যত যুদ্ধ করেছ এর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সময় আজ।

নারীদের মধ্যে হযরত উম্মে আবান, উম্মে হাকিম, আসমা বিনতে আবু বকর, হযরত খাওলা, হযরত উম্মে সালামা ও হযরত লুবানা রাযি. অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তবে এর মধ্যে যাঁর বীরত্ব ছিল তুলনাহীন, যাঁর ভূমিকা ছিল সবার ঊর্ধ্বে, যাঁর সাহসিকতা-রণদক্ষতা ছিল অবিস্মরণীয় তিনি হলেন, হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ ইবনে সাকান রাযি.।

যখন রণাঙ্গন পুরোপুরি উত্তপ্ত হয়ে উঠল, যুদ্ধের লেলিহান শিখা যখন দাউ দাউ করে উঠল, তলোয়ারের ঝনঝনানিতে যখন চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল, তখন নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। ভুলেই গেলেন তিনি একজন নারী। শাহাদাতের অদম্য স্পৃহা তাঁকে পাগল করে তুলেছে। অগ্রসর হয়ে গেলেন যুদ্ধের দিকে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। কিন্তু কী দিয়ে লড়বেন তিনি? তাঁর নেই কোনো তলোয়ার। বর্শা-বল্লমও নেই তাঁর হাতে। তীর-ধনুকও নেই। সামনে পেলেন তাঁবুর খুঁটি। যথেষ্ট। তা নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুসারির ভিতর। সর্বশক্তি ব্যয় করে চললেন তিনি শত্রুনিধনের মহড়ায়। দারুণ লড়ছেন

তিনি। হাতের খুঁটি দিয়ে। ডানে বামে হামলা করে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছেন। একে-একে নয়জন রোমান সৈন্যকে যমালয়ে পাঠালেন এই বীরাঙ্গনা। চিরতরে তাদের যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দিলেন।

পাঁচ দিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অবশেষে মুসলমানদের বিজয় হল। বহু রোমান সেনা প্রাণ হারাল। চারদিকে শুধু লাশ আর লাশ। ইয়ারমুক প্রান্তরে শুধু লাশই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এক লক্ষাধিক লাশের এক মহাসমাবেশ। পৃথিবীর ইতিহাসে এর নজির পাওয়া দুষ্কর।

রোমানদের অতীতের সব অহঙ্কার, অহমিকা মাটিতে মিশে গেল। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল তাদের অহমিকা। অপর দিকে মুসলমানদের জজবা ও উদ্দীপনা আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেল।

এ-যুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ছিল মনে রাখার মতো। তাঁদের মধ্যে হযরত আসমা বিনতে যিয়াদ রাযি.-এর বীরত্ব ছিল অতুলনীয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের এবং তাঁদের পথে চলার তৌফিক দান করুক। আমিন।

বীরাঙ্গনা হযরত খাওলা রাযি.

১৩ হিজরী। চারদিকে ইসলামের জয়জয়কার। ইসলামের সুশীতল হাওয়া বইছে এখন আরবের বাইরেও। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. খেলাফতের মসনদে সমাসীন। ইসলামের সমস্ত কিছু আন্‌জাম দিয়ে যাচ্ছেন সুচারুভাবে। বীর মুজাহিদগণ দূর-দূরান্তে, দেশ-দেশান্তরে ছুটে চলছেন। চারদিকে ইসলামের হেলাল পত্‌ পত্‌ করে উড়ছে। জীবনবাজি রেখে দীনের জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন মুজাহিদগণ। দেশের পর দেশ জয় করে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছেন। অনেকে শাহাদাত বরণ করছেন আবার অনেকে বিজয়মাল্য নিয়ে ফিরছেন। বেশ ছন্দের সঙ্গে চলছে ইসলামী জীবনধারা।

এর মধ্যে আরবের প্রসিদ্ধ কবিলা আসাদ বিন খুজায়ফার দুই সহোদর হযরত যিরার বিন আযওয়ার ও হযরত খাওলা বিনতে আযওয়ার রাযি. অন্যদের চাইতে কিছুটা ব্যতিক্রম। তাঁদের বীরত্ব ও সাহসিকতা ভোলার মতো নয়। তাঁদের সমর অভিজ্ঞতা, রণদক্ষতা, বীরত্বপূর্ণ অমর কীর্তি আজও মুমিনদের অন্তরে জিহাদি চেতনা উজ্জীবিত করে তোলে।

হযরত যিরার রাযি. এর রণদক্ষতা ছিল অসাধারণ। সারা আরবে তাঁর

সুখ্যাতি ছিল। তিনি কখনও বর্ম পরিধান করে ময়দানে অবতীর্ণ হতেন। কখনওবা বর্ম ছাড়াই রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তাঁকে এক হাজার যোদ্ধার সমতুল্য মনে করা হত। রোমসাম্রাজ্যে সঙ্ঘটিত যুদ্ধসমূহে হযরত যিরার ও হযরত খাওলা রাযি. অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের উপমা পেশ করেন। তাঁদের বীরত্বগাথা সরাসরি রণাঙ্গন থেকেই উপভোগ করব আমরা।

মুজাহিদ বাহিনী হযরত খালেদ বিন ওলিদ রাযি.-এর নেতৃত্বে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক অবরোধ করে নিল। সেনাপতি খালেদ বিন ওলিদ রাযি. গোয়েন্দা মারফত জানতে পারলেন সিরিয়াবাসীদের সাহায্যার্থে রোমানদের একটি দল দামেস্ক অভিমুখে এগিয়ে আসছে। তাঁদের নির্বিঘ্নে আসতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না সেনাপতি খালেদ বিন ওলিদ। তাই হযরত যিয়ার রাযি.-কে ডেকে নির্দেশ দিলেন, যিরার! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি অগ্রসর হও। রোমান সৈন্যদের বিরুদ্ধে পথেই প্রতিরোধ গড়ে তোল।

মুসলিম সেনাগণ অগ্রসর হয়ে জানতে পারলেন রোমানদের সৈন্যসংখ্যা ১২ হাজার। সে তুলনায় মুসলিমবাহিনী ছিল নগণ্য সংখ্যক। তাই কিছু মুজাহিদের অভিমত ছিল এত সামান্য সেনা নিয়ে তাদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু হযরত যিরার রাযি. কারও কথায় কর্ণপাত করলেন না। বীরদর্পে অগ্রসর হয়ে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রোমান সেনাদের মাঝে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। একের পর এক শত্রু নিধন করে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন যিরার রাযি.। এক পর্যায়ে শত্রুদের সেনাপ্রধান ওয়ার্দানের নিকট পৌঁছে গেলেন তিনি। সে ছিল বহু সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত। যিরার মরণপণ আক্রমণ করলেন। হঠাৎ একটি তীর এসে আঘাত হানল যিরার রাযি. এর বাহুতে। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি পাল্টা আক্রমণ করে চিরতরে খতম করে দিলেন তীর নিক্ষেপকারীকে।

যুদ্ধের অবস্থা রোমানবাহিনীর প্রতিকূলে দেখে নিজেদের ব্যূহ সঙ্কুচিত করতে লাগল তারা। মুজাহিদগণ যিরারের সাহায্যে এগিয়ে আসতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর ঘোড়া হোঁচট খেয়ে জমিনে লুটিয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে রোমানবাহিনী হযরত যিরার রাযি.-কে বন্দি করে ফেলল।

মুজাহিদগণ যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে পরিস্থিতি অবগত করানোর জন্য একজন দ্রুতগামী আশ্বারোহীকে পাঠিয়ে দেওয়া হল সেনাপতি খালেদ বিন ওলিদের নিকট। যিরার রাযি.-এর বন্দি হওয়ার সংবাদ শোনামাত্র বিদ্যুৎ

খেলে গেল খালেদ বিন ওলিদের দেহে। বজ্র হুঙ্কার তাঁর।

কাফেরগোষ্ঠির এতো স্পর্ধা! এতো শক্তি ওদের! না, আর সহ্য করা যায় না। যে কোনো মূল্যে যিরারকে ওদের হাত থেকে মুক্ত করে আনতে হবে।

সঙ্গে-সঙ্গে সেনাপতি খালেদ বিন ওলিদ রাযি. যুদ্ধের মোড় রোমানদের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। এবং ব্যাপক হামলার নির্দেশ দিলেন। মুসলিম বাহিনী বীরদর্পে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। হঠাৎ সেনাপতি খালেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল লাল রঙের তেজি ঘোড়ায় আরোহিত এক ব্যক্তির উপর, যাঁর চলাফেরায় রণকৌশল, সমরদক্ষতা ও বীরত্ব টপকে পড়ছিল। লৌহবর্মের উপর কালো পোশাকাবৃত সেনাটিকে চেনার উপায় নেই। সবুজ পাগড়ি দ্বারা কোমর কষে বেঁধে রেখেছে সে। হাতে ধারালো তীক্ষ্ণ চকচকে একটি বর্শা শোভা পাচ্ছে। ভীষণ ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য। বিস্ময়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে সেনাপতি খালিদ।

লড়াই শুরু হয়ে গেল। ভয়াবহ যুদ্ধ। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাঝে সেই সেনাটি দেখা যাচ্ছে। অশ্বারোহী সৈনিকটি রোমানদের উপর এমনভাবে আক্রমণ করছে যেন আহত সিংহ। শত্রুবাহিনীকে তছনছ করে দিল সে। তোলপাড় সৃষ্টি হয়ে গেল তাদের মাঝে। শত্রুবাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে বিদ্যুৎ বেগে চার-পাঁচজন শত্রু সেনাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌছিয়ে দিয়ে আবার নিজ জায়গায় ফিরে আসে সে।

অনুপম রণদক্ষতা তাঁর। লাশের স্তুপ গড়ে তুলল সে। মুজাহিদীনের মাঝে কৌতূহল জাগ্রত হল। কে এই বীর, যার বীরত্বের সামনে খড়কুটোর ন্যায় ভেসে যাচ্ছে শত্রুবাহিনী।

দ্বিতীয়বার আক্রমণ হল। এবার সেনাপতি খালেদ রাযি. সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ সেই অশ্বারোহীকে দেখতে পেলেন। তার দেহ ক্ষতবিক্ষত। ঘোড়া তাঁর ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত। তবু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় রোমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে সে। একেবারে শত্রুবাহিনীর ভিতরে ঢুকে পড়ল। যখনই কোনো শত্রু তাঁর সামনে আসে প্রাণের মায়ায় সে দৌড়ে পালায়। প্রায় একাই সে শত্রুবাহিনীকে তাড়িয়ে বেড়াতে লাগল। রোমানদের হিম্মত নেই তাঁর সামনে এসে দাঁড়াবার। তাঁর দক্ষতা দেখে হতবাক হয়ে গেলেন সেনাপতি খালেদ রাযি.। কিন্তু কেউ তাঁকে চেনে না। তাঁর পরিচয় জানেন না খোদ সেনাপতি। তাই তাঁকে লক্ষ করে বললেন, দারুণ রণদক্ষতা

দেখালে তুমি। কে তুমি? তোমার পরিচয় কি? অশ্বারোহী নীরব দাঁড়িয়ে রইল। কোনো সাড়া নেই।

হে বাহাদুর যুবক, তুমি আমাকে এবং পুরো মুসলিমবাহিনীকে অস্থিরতায় ফেলে দিয়েছ। কেন তোমার পরিচয় লুকাচ্ছ? আমি সেনাপতি, তোমার পরিচয় জানার অধিকার আমার আছে। বল, কে তুমি?

এবার অশ্বারোহী মুখ খুলল। অবনত মস্তকে মেয়েলী কণ্ঠে বলতে লাগল, আমি নারী। তাই পরিচয় দিতে সঙ্কোচবোধ করছি। আমার হৃদয়ের ব্যথা আমাকে রণাঙ্গনে টেনে এনেছে। আমার নাম খাওলা। আমি যিরারের বোন। তাঁর বন্দিত্বের কথা শুনে ময়দানে এসেছি।

তাঁর কথা শুনে হযরত খালেদ বিন ওলিদ রাযি. কেঁদে ফেললেন। একজন নারী এতো বীরত্ব দেখাতে পারে? তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। আশীর্বাদ জানাই তোমার বীরত্বকে। শান্ত হও হে মেয়ে। তোমার ভাই যদি বেঁচে থাকে তবে অবশ্যই তাকে মুক্ত করা হবে। আর যদি সে শহীদ হয়ে যায় তবে তাঁর প্রত্যেক ফোঁটা রক্তের বদলা নেওয়া হবে রোমানদের থেকে।

এরপর নব উদ্যমে মুসলিম বাহিনী রোমান সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে বীরাঙ্গনা খাওলা রাযি.। এক পর্যায়ে তাঁরা হযরত যিরার রাযি.-কে শত্রুবাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করে আনলেন।

দামেস্ক এখনও পুরোপুরি মুসলমানদের আয়ত্তে আসে নি। রোমসম্রাট হেরাক্লিয়াস বিরাট এক বাহিনী আজনাদিন নামক স্থানে পাঠাল। গোয়েন্দা মারফত সেনাপতি খালেদ তা জানতে পারলেন। তাই তিনি এ নিয়ে পরামর্শসভা আহ্বান করলেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুসলিম বাহিনী সাময়িকভাবে দামেস্কের অবরোধ তুলে নিল এবং সকল মুজাহিদ আজনাদিনের দিকে অগ্রসর হল। সেনাদের নিয়ে সেনাপতি খালেদ বিন ওলিদ রাযি. আগে রওনা হলেন। মহিলা ও শিশুদের নিয়ে হযরত আবু ওবায়দা রাযি. পিছনে আসছিলেন।

রোমান সেনাপতি পিটার ও পোলাসন খুশিতে নাচতে লাগল। এই তো মুসলমানরা অবরোধ তুলে নিয়ে পালাচ্ছে। ওদের যুদ্ধের সাধ চিরতরে মিটিয়ে দেওয়ার এই তো মোক্ষম সুযোগ।

যেমন সিদ্ধান্ত তেমন কাজ। কালবিলম্ব না করে উভয় সেনাপতি মিলে ষোল হাজার পদাতিক ও আশ্বারোহী নিয়ে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে

পড়ল। তাদের অতর্কিত হামলায় কিছু মহিলা বন্দি হল রোমানদের হাতে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন বীরাঙ্গনা খাওলা রাযি.।

রোমান সৈন্যরা বন্দিদের উপর নির্যাতন চালানোর চেষ্টা করল। আর শান্ত থাকতে পারলেন না হযরত খাওলা রাযি.। যেন তাঁর সারা অঙ্গে আগুন ধরে গেল। ঈমানি জজবায় জোশ খেলে গেল। ফুঁসে উঠলেন তিনি। যেন ক্ষুধার্ত বাঘিনী। তিনি অন্য বন্দিনীদের লক্ষ করে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন।

হে আমার মুসলিম বোনেরা! আমরা আরবের সন্তান। এরচেয়ে বড় কথা হল আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা। সুতরাং কাফেরদের হাতে বন্দিনী হয়ে আমরা বাঁচতে চাই না। আমরা আমরণ লড়ে যাব।

হে হিমইয়ারের কন্যারা! হে তুব্বার মেয়েরা! তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে, রোমানরা তোমাদের বাঁদী বানিয়ে রাখবে? কোথায় তোমাদের আত্মমর্যাদাবোধ? কোথায় তোমাদের বীরত্ব, যা আরবের বড়-বড় মজলিসে আলোচনা করা হয়। ছোট ছেলে-মেয়েরা সেই বিরত্বের কবিতা আবৃত্তি করে।

পৃথিবীর কোনো শক্তি তাঁদের গতিরোধ করতে পারে না। বন্দি নারীদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল হিমইয়ারি ও তুব্বা গোত্রের। তাঁরা নিশানা নির্ধারণ ও সাহসিকতায় ছিল অদ্বিতীয়। খাওলার আগুনঝরা বক্তৃতায় তাঁদের নিভে যাওয়া আগুন আবার দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। টান-টান উত্তেজনা বিরাজ করছে সবার মধ্যে। উদ্দীপনার ঢেউ খেলে গেল সবার তনুমনে। সবাই সমস্বরে বলে উঠল, আমরা প্রস্তুত যুদ্ধের জন্য। তবে কী দিয়ে লড়ব আমরা? আমাদের তো অস্ত্র নেই।

হযরত খাওলা রাযি.-এর কণ্ঠ আবার বেঁজে উঠল, আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসীরা অস্ত্রের উপর ভরসা করে না। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। যার হাতে যা আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড় শত্রুর মোকাবেলায়। আল্লাহর নুসরত আমাদের সাথী। চল, আমরা তাঁবুর খুঁটিগুলো তুলে নিই। এগুলোই আমাদের অস্ত্রের কাজ দিবে। হয়ত শাহাদাত অথবা গৌরবময় বিজয় অর্জন করব। কিছুতেই তাদের হাতে বন্দী হব না।

হযরত খাওলা রাযি. নারীদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে রোমান সৈনিকেরা মুসলিম নারীদের ঘিরে নিল। জানবাজ আরব-নারীরাও এত সহজে দমবার নয়। শুরু হল লড়াই। তুমুল লড়াই।

আঘাতের পর আঘাত হানতে লাগল মুসলিম রমণীরা রোমান সৈনিকদের উপর। মুসলিম নারীদের উপর্যুপরি হামলায় ৩০ জন রোমান সেনা প্রাণ হারালো। আহত হল আরও অনেক।

এতক্ষণে সেনাপতি খালেদ বিন ওলিদ রাযি. মুসলিম নারীদের বন্দি হওয়ার খবর জেনে গেছেন। তৎক্ষণাৎ একটি সেনা ইউনিট সেদিকে রওনা করিয়ে দিলেন।

মুসলিম মুজাহিদগণ ক্ষিপ্র গতিতে পিছন দিকে এসে রোমানদের উপর থেকে আক্রমণ করে বসল। তাকবীর ধ্বনিতে কেঁপে উঠল পুরো রণাঙ্গন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোমানরা লেজ গোটাতে লাগল। অস্ত্রশস্ত্র ফেলে তারা ময়দান ছেড়ে পালাতে শুরু করল। ইতোমধ্যে হযরত যিরার রাযি. সেনাপতি পিটারকে দূরে দেখতে পেলেন। পরক্ষণেই একটি তীর ছুটে গেল রোমান সেনাপতি পিটারের দিকে। সে কুপোকাত। এভাবে আল্লাহ তাআলা হযরত খাওলা রাযি. এর দলকে এক মহাবিজয় উপহার দিলেন। মুসলিম মহিলাগণ সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। মহান আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল তাঁরা।

রোমানদের সঙ্গে মুসলমানদের প্রত্যেকটি যুদ্ধে বীরাঙ্গনা খাওলা রাযি. অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি পরবর্তীকালের মুসলিম রমণীদের জন্য রেখে গেছেন আদর্শ উপমা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার তওফিক দান করুন।

কল্যাণকামী আরেক জননী

ইমাম রাবিয়া আর-রায় ছিলেন জ্ঞানের আকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইসলামের ইতিহাসে তিনি ছিলেন এক অনন্য প্রতিভা। এক হীরক খণ্ড।

তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছিল সীমাহীন। তাবেঈ ইমামদের মধ্যে তিনি ছিলেন এক অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবন গঠনে তাঁর মাতা উম্মে রাবিয়ার অবদান কেবল অনন্য ও অতুলনীয়ই নয় বরং তা ছিল সীমাহীন বিস্ময়কর ও প্রেরণাদীপ্ত এক উপাখ্যান।

৫১ হিজরির কথা। তখন ছিল মুসলিম ইতিহাসের এক গৌরবময় সোনালি অধ্যায়। মুসলমানদের বিজয়ী অশ্ব যুগ-যুগান্তরে নির্যাতিত মানবতাকেই সংবাদ দিচ্ছিল আলো ঝলমল নতুন দিগন্তের। মূর্তিপূজার

আঁধারে নিমজ্জিত বনি আদমকে শেখাচ্ছিল চিরন্তন শাশ্বত আকীদা-বিশ্বাস। যুগ-যুগান্তরের প্রতিমা পূজারী মানুষেরা নত হচ্ছিল মহান আল্লাহ পাকের সামনে। পূর্ব দিকে তখন এ-বিজয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মহান সাহাবী রাবী বিন জিয়াদ হারেসি রাযি.। তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর দুঃসাহসী ও বিশ্বাসী গোলাম ফররুখ। রাবী রাযি. তখন উপনীত হয়েছিলেন জীবনের শেষপ্রান্তে। সিজিস্তান ও তার আশপাশের এলাকা জয় করার পর তিনি ইসলামের বিজয় নিশানকে জায়হুন নদীর ওপারে বয়ে নিয়ে যেতে সংকল্প করেছিলেন। এ ছিল তাঁর জীবনের শেষ আকাঙ্ক্ষা। তাঁর এ-মহান স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে তিনি সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। নির্দিষ্ট দিনে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের ময়দানে ফররুখের বীরত্ব ও সাহসিকতায় রাবী রাযি. মুজাহিদ বাহিনীকে নিয়ে দু-রাকাত শোকরানা নামায আদায় করেন। এরপর তিনি যুদ্ধের ময়দানে অনুপম বীরত্বের স্বাক্ষর রাখার জন্য ফররুখকে পুরস্কৃত করেন। তিনি তাঁকে আযাদ করে দেন এবং গণিমতের অংশ ছাড়াও নিজের পক্ষ থেকে আরও বেশি দান করেন।

এর কিছুদিন পরই মহান সিপাহসালার রাবী ইবনে জিয়াদ হারেসি রাযি. আল্লাহ পাকের ডাকে সাড়া দেন। ফররুখ চলে আসেন মদীনায়। তাঁর বয়স তখন ত্রিশের কোটা পেরিয়ে যাচ্ছে। তিনি প্রাণচঞ্চল ও পরিপূর্ণ যৌবনের অধিকারী এক তরুণ। মদীনায় তিনি একটি বড় বাড়ি ক্রয় করেন। একজন বুদ্ধিমতী ও গুণবতী নারীকে বিবাহ করেন। বসবাস শুরু করেন একটি সুখের নীড়ে এবং স্ত্রীর সান্নিধ্যে তিনি খুঁজে পান জীবনের সজীবতা ও আনন্দের ঐশ্বর্য্য। কিন্তু তাঁর মন সর্বদা পড়ে থাকত জিহাদের ময়দানে। তাঁর কানে ভেসে আসত জিহাদের মাঠে ছুটন্ত অশ্বের খুরধ্বনি ও অস্ত্রের ঝনঝনানি। আবার জিহাদে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর অন্তরে জ্বলত ধিকিধিকি। এক জুমার দিন তিনি মসজিদের খতিবকে জিহাদের জন্য লোকেদের উৎসাহিত করতে শুনলেন। শুনে ফররুখ মুজাহিদদের সঙ্গে শামিল হওয়ার সংকল্প করলেন। ঘরে গিয়ে সংকল্পের কথা স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করলে স্ত্রী বললেন, আবু আবদুর রহমান আপনি আমাকে ও আপনার ভাবী সন্তানকে কোথায় রেখে যাচ্ছেন? ফররুখ বললেন, আমি তোমাকে, তোমার সন্তানকে আল্লাহ পাকের কাছে রেখে যাচ্ছি। আর আমি তোমাকে ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে যাচ্ছি। তুমি এগুলো হেফাজত করো এবং তোমার সন্তানের জন্য খরচ করো।

আল্লাহর মঞ্জুর হলে ফিরে আসতে পারি আবার জিহাদে শহীদও হতে পারি। আল্লাহ হাফেজ।

ফররুখ চলে যান জিহাদের ময়দানে। ফররুখ তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার কিছুদিন পরই তার স্ত্রীর কোলজুড়ে আসে ফুটফুটে এক পুত্রসন্তান। স্ত্রী এ-শিশুকে দেখে ভুলে যান স্বামীর বিরহ। মায়াকাড়া চেহারার অধিকারী এ-শিশুটি তাঁর সব দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। তিনি তার নাম রাখেন রাবিয়া। শিশুকাল থেকেই রাবিয়ার মাঝে ফুটে উঠতে থাকে এক অনন্য প্রতিভা। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাস ফুটে উঠে ছোট বেলাতেই। শিশু রাবিয়া হয়ে ওঠেন তার মায়ের ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু। ছোট্ট রাবিয়াকে ঘিরে তাঁর মায়ের সব স্বপ্ন আবর্তিত হতে থাকে। একটু বড় হলে তিনি তাকে উস্তাদের কাছে পড়তে দেন। অল্পদিনেই রাবিয়া লেখাপড়ায় উৎকর্ষসাধন করে। কুরআন হিফজ করে ও সুললিত ভঙ্গিমায় তা পাঠ করতে শিখে। সঙ্গে সঙ্গে আয়ত্ত করে নেয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও আরবি ভাষা এবং যতটুকু সম্ভব দীনের হুকুম-আহকামও। উম্মে রাবিয়া ছেলের সম্মানিত ওস্তাদবৃন্দকে প্রচুর উপহার-উপঢৌকন পেশ করেন। তিনি রাবিয়ার পিতার অপেক্ষা করতেন এবং চেষ্টা করতেন যাতে রাবিয়া একদিন তার এবং ফররুখের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূরূপে গড়ে উঠতে পারে এবং তার মাঝে যাতে তারা পান চোখের শীতলতা।

কিন্তু দিনে দিনে ফররুখের অনুপস্থিতি দীর্ঘতর হতে থাকে। তাঁর সম্পর্কে লোকমুখে নানান ধরনের কথা ছড়িয়ে পড়ে। কেউ বলতে থাকে, তিনি শত্রুর হাতে বন্দি হয়ে গেছেন। কেউ বলতে থাকে, তিনি এখনও জিহাদ করে যাচ্ছেন। যুদ্ধ-ফেরত তৃতীয় আরেকদল বলতে থাকে, তিনি জিহাদে বরণ করে নিয়েছেন তার কাঙ্ক্ষিত শাহাদাত। ফররুখের দীর্ঘ অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উম্মে রাবিয়ার কাছে তার শাহাদাতের কথাই যথার্থ মনে হয়। সীমাহীন শোক-যাতনায় তার হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তিনি তা আল্লাহ পাকের কাছে সোপর্দ করেন। ক্রমে ছোট্ট রাবিয়া বয়ঃসন্ধিক্ষণে উপনীত হন। লোকেরা উম্মে রাবিয়াকে পরামর্শ দিতে লাগল যে, রাবিয়া এখন বয়সের তুলনায় প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছে। সে লেখাপড়ায় তার সমবয়সীদের ছাড়িয়ে অনেক উর্ধ্বে উঠে গেছে। সে কুরআন হিফজ করেছে। হাদীসও বর্ণনা করছে। এখন যদি আপনি তাকে ব্যবসায় বা অন্য কোনো কাজে নিয়োজিত করেন

তবে সে উন্নতি করবে। আপনাদের উভয়ের জন্যই তা কল্যাণকর হবে।

তাদের এসব কথার জবাবে উম্মে রাবিয়া বলেন, আমি আল্লাহ পাকের কাছে কামনা করি, যাতে তিনি তার জন্য তা-ই মনোনীত করেন, যা তার ইহকাল ও পরকাল উভয়কেই আলোকিত করবে। রাবিয়া নিজের জন্য জ্ঞানসাধনাকে বেছে নিয়েছে। সে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরূপেই জীবন কাটাবে মনস্থ করেছে।

রাবিয়া একের পর এক পার হতে থাকে কাঙ্ক্ষিত মনযিলের সিঁড়ি। উপস্থিত হতে থাকে মসজিদে নববীর দরসে। মসজিদে নববী তখন ছিল নববী-ইলমের প্রাণকেন্দ্র। সর্বদা তা মুখরিত থাকত হাজারো জ্ঞানপিপাসুর কোলাহলে। রাবিয়া সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যাঁরা জীবিত ছিলেন তাঁদের থেকে হাদীসের দরস নেয়। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন রাসূলুল্লাহর প্রিয় খাদেম হযরত আনাস বিন মালিক রাযি.। রাবিয়া দরস নেয় প্রথম শ্রেণির তাবেঈদের কাছ থেকে। যেমন হযরত সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, মাকহুল শামী ও সালামা ইবনে দিনার প্রমুখ।

রবিয়া ইলমের জন্য কঠোর মুজাহাদা ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। কেউ তাঁকে বিশ্রাম ও শরীরের দিকে লক্ষ রাখার কথা বললে রাবিয়া বলত, আমি আমার শায়েখদেরকে বলতে শুনেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার সমগ্রসত্তাকে ইলমের জন্য, ইলমের সাধনায় নিয়োজিত না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি ইলমের কিছু অংশও অর্জন করতে পারবে না। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। রাবিয়া সমাসীন হয় শ্রদ্ধা ও সম্মানের শীর্ষে। তাঁর নাম উচ্চারিত হতে থাকে মর্যাদাশীল জ্ঞানতাপসগণের সঙ্গে, প্রথম সারিতে। তাঁর জীবন হয়ে ওঠে ঈর্ষণীয়। রাবিয়া দিনের একভাগ নির্দিষ্ট করে নেয় গৃহে পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে কাটানোর জন্য। আরেক ভাগ নির্দিষ্ট করে নেয় মসজিদে নববীর মজলিস ও হালাকাসমূহের জন্য।

এক চাঁদনি রাতের সন্ধ্যাবেলা মদীনার জনাকীর্ণ পথ ধরে চলছেন ষাটের কাছাকাছি বয়সের এক বৃদ্ধ, ঘোড়ায় চড়ে। তার পিঠে ঢাল, হাতে বর্শা, কোমরে বাধা তলোয়ার। পথের দিকে তার লক্ষ নেই। তিনি ডুবে রয়েছেন চিন্তার সমুদ্রে। তার শূন্য হৃদয়ে বুদবুদের মতো উঁকি দিয়ে উঠছে কত ভাবনা। তিনি নিজেকে প্রশ্ন করছেন, ত্রিশ বছর আগেকার তার সাজানো বাড়ি, তা কি এখনো রয়েছে, আগের মতো নাকি তার উপর দিয়ে বয়ে গেছে কালের

ভাঙা-গড়ার স্বাক্ষর। তার পূর্ণ যৌবনা স্ত্রী এখন কী অবস্থায় আছেন? আর তার গর্ভস্থ সেই সন্তান? সে মৃত না জীবিত? জীবিত থাকলে তার কী অবস্থা? সে কি চিনতে পারবে তার মুসাফির বাবাকে? আরও কত শত ভাবনা উঁকি দিয়ে উঠছিল তার হৃদয়ের বাতায়ন পথে।

এসব ভাবনার মাঝেই নিজেকে তিনি আবিষ্কার করলেন তার বাড়ির সামনে। গেট খোলা দেখে তিনি উল্লাসিত হয়ে বাড়িতে ঢুকে দরজায় কড়া নাড়লেন। আনন্দের আতিশয্যে তিনি অনুমতি নিতে ভুলে গেলেন। আওয়াজ শুনে গৃহকর্তা উপর থেকে নিচের দিকে তাকাল। চাঁদের আলোয় নিজের গৃহের দরজায় অপরিচিত অস্ত্রসজ্জিত এক ঘোড়সওয়ারকে দেখে রাগে ফেটে পড়ল। দৌড়ে নিচে নেমে এসে বলল, রে আল্লাহর শত্রু! রাতের সুযোগ নিয়ে তুমি আমার ঘরে আক্রমণ করছ? আঘাত হানছ আমার ইজ্জতের উপর? আমি তোমাকে কাজির কাছে নিয়ে যাব। চারদিক থেকে প্রতিবেশীরা ছুটে এলেন। গৃহকর্তা তার গলায় শেকল পরিয়ে দিল। বলল, আল্লাহর শত্রু, আমি তোমাকে কাজির কাছেই নিয়ে যাব। অপরিচিত লোকটি এবার গলা উঁচু করে বললেন, আমি আল্লাহর শত্রু নই। আমি এ গৃহে অনধিকার চর্চায় প্রবেশ করি নি। এটা আমার বাড়ি। এর দরজা খোলা দেখে আমি এতে প্রবেশ করেছি। খানিক চুপ করে সমবেত প্রতিবেশীদেরকে লক্ষ করে বললেন, হে কওম! এটা আমার বাড়ি। এটা আমিই ক্রয় করেছিলাম। আমি ফররুখ। প্রতিবেশীদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই, যে ফররুখকে চেনে? আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে আমি জিহাদের জন্য গৃহ ত্যাগ করেছিলাম।

গৃহকর্তার মা তখন নিদ্রিত ছিলেন। কোলাহল শুনে তিনি জেগে উঠলেন। উপর তলার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে তিনি তাঁর স্বামীকে দেখতে পেলেন। তাঁর দেহে কম্পন শুরু হল। আড়ষ্ট হয়ে এল জিহ্বা। তবু তিনি যথাসম্ভব সংযত হয়ে বললেন, তোমরা তাঁকে ছেড়ে দাও। রাবিয়া, ছেড়ে দাও তাঁকে। উনিই তো তোমার পিতা, হে আবু আবদুর রহমান এ আপনার সন্তান। আপনার আদরের টুকরা। এ-কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ফররুখ রাবিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁদের চোখে দেখা দিল আনন্দের অশ্রু। বিস্ময়াভিভূত প্রতিবেশীরা ঘরে ফিরে গেল। উম্মে রাবিয়া নিচে নেমে স্বামীকে সালাম করলেন। ফররুখের উপস্থিতি উম্মে রাবিয়ার কাছে মনে হচ্ছিল স্বপ্নের মতো। তিনি ভাবতেই পারছিলেন না যে, যিনি জিহাদে শহীদ হয়েছেন তিনিই আজ

তার চোখের সামনে। ফররুখ স্ত্রীর কাছে বসে কুশলাদি জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

উম্মে রাবিয়া কথাবার্তার মাঝে আনমনা হয়ে কী যেন ভাবছিলেন। এতো আনন্দের মাঝেও আনন্দ ছাপিয়ে তার মনে জেগে উঠছিল একটি ভয়। ফররুখ যদি তাকে জিজ্ঞেস করেন সেই ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রার কথা, যা তিনি তার কাছে আমানত রেখে গিয়েছেন, তিনি কিভাবে বলবেন যে, তার একটি মুদ্রাও অবশিষ্ট নেই? উম্মে রাবিয়া ঘুরপাক খাচ্ছিলেন এমনতর ভাবনার অলি-গলিতে। ফররুখ বললেন, উম্মে রাবিয়া, আমি চার হাজার দিনার নিয়ে এসেছি। তোমার কাছে যে ত্রিশ হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) রেখে গিয়েছিলাম সেগুলোও নিয়ে এস। উম্মে রাবিয়া বললেন, আমি সেগুলো হেফাজত করেছি। আপনি সুস্থির হোন। দু-তিন দিন পর তা বের করব, ইতোমধ্যে আযান শুনতে পেয়ে ফররুখ তরিঘরি মসজিদে গেলেন। মসজিদে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে, এই মাত্র নামায শেষ হয়েছে। তিনি একাকী নামায পড়লেন। মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দেখতে পেলেন, মসজিদ চত্বরে মানুষের ভিড়। বড় বড় ফকীহ, আমির-ওমারা, শ্বেত শশ্রুধারী বৃদ্ধ, তরুণ-যুবা-কিশোর-বালক ও শিক্ষার্থীরা সবাই একজন শায়খকে ঘিরে বসে রয়েছে। শায়খের মুখের প্রতিটি কথা তারা লুফে নিচ্ছেন মুক্তোর মতো। খাতায় লিখে নিচ্ছেন। মানুষের সংখ্যাধিক্যের কারণে মুবাল্লিগরা শায়খের প্রতিটি কথা পঙক্তি করে পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন মজলিসের প্রান্তদেশ পর্যন্ত। মজলিসে বিরাজ করছে পিনপতন নীরবতা। অদৃষ্টপূর্ব এই দৃশ্য দেখে ফররুখ বিস্মিত বিমোহিত হয়ে পড়লেন। তিনি শায়খের চেহারা দেখতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু অত্যধিক ভিড়ের কারণে পারলেন না। ফররুখ মজলিসের এক কোণে বসে পড়লেন। শায়খের আশ্চর্য মেধা, বিস্তৃত জ্ঞানের পরিধি ও বিস্ময়কর উপস্থাপনভঙ্গিমা ফররুখের উত্তরোত্তর বিস্ময় বৃদ্ধি করছিল। মজলিস শেষ হলে লোকেরা শায়খকে মসজিদের বাইরে এগিয়ে নিয়ে গেল। ফররুখ তার পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই! শায়খটি কে? লোকটি আশ্চর্য হয়ে বললেন, সে কি? আপনি মদীনার লোক নন! ফররুখ বললেন, হ্যাঁ, আমি মদীনার লোক। লোকটি এবার ততোধিক বিস্মিত হয়ে বললেন, মদীনায় এমন কি কেউ আছে যে শায়খকে চেনে না? ফররুখ বললেন, হ্যাঁ, আমি প্রায় ত্রিশ বছর মদীনায় ছিলাম না। তাই আমি শায়খের সঙ্গে পরিচিত নই। লোকটি বললেন, আচ্ছা!

আপনি বসুন আমি শায়খের পরিচয় দিচ্ছি।

তারপর বলতে শুরু করলেন, তিনি তাবেঈদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং অনন্য মর্যাদার অধিকারী। অল্প বয়স হওয়া সত্ত্বেও তিনি অধিকার করেছেন মদীনার ফকীহ, ইমাম ও মুহাদ্দিসের আসন। তার মজলিসে অংশগ্রহণ করেন বড় বড় মুহাদ্দিস এবং ফকিহগণ। যেমন, মালিক ইবনে আনাস, আবু হানিফা, ইয়াহয়া, ইবনে সাঈদ আনসারি, সুফিয়ান সাওরি, আবদুর রহমান ইবনে আমর আওযায়ী এবং লায়স ইবনে সাদ প্রমুখ। ফররুখ কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। লোকটি সে সুযোগ না দিয়ে পুনরায় বলতে শুরু করলেন, সর্বোপরি তিনি বিনয়ী, নম্র এবং কোমল আচরণকারী। মদীনার লোকেরা তাঁর চেয়ে দানশীল, আল্লাহর জন্য নিবেদিতপ্রাণ সংযমী তাপস কাউকে জানে না। ফররুখ বললেন, তাঁর নাম কি? লোকটি বললেন, রাবিয়াতুর রায়। ফররুখ চমকে উঠলেন, রাবিয়াতুর রায়! লোকটি বললেন, হ্যাঁ, তার নাম রাবিয়া। কিন্তু মদীনার উলামায়ে কিরাম ও ফকীহগণ তাকে রাবিয়াতুর রায় নামে ডেকে থাকেন। কেননা কুরআন-হাদীসে কোনো বিষয়ে ফয়সালা না পেলে তাঁরা তাঁর কাছে যান। তিনি তাতে ইজতেহাদ করে ফয়সালা প্রদান করেন। ফররুখ আগ্রহ সহকারে বললেন, তার বংশপরিচয় কি? লোকটি বললেন, তিনি রাবিয়াতুর রায় ইবনে ফররুখ আবু আবদুর রহমান। তাঁর বাবা তাঁকে গর্ভে রেখে জিহাদে গিয়েছিলেন। তাঁর জন্মের পর তাঁর মা তাকে লালনপালন করেন ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। আজ এশার নামাযের পূর্বে শুনেছি লোকেরা আলোচনা করছে যে, দীর্ঘ ত্রিশ বছর পর তাঁর বাবা মদীনায় ফিরে এসেছেন। এতটুকু শোনার পর ফররুখের চোখ বেয়ে দু-ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। লোকটি বুঝতে পারলেন না, এ-অশ্রুপাতের কারণ। তিনি তাকিয়ে রইলেন বিস্ময়াভিভূত হয়ে। ফররুখ দ্রুত বাড়ির পথে প্রস্থান করলেন। প্রতি কদমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাঁর চলার গতি। তাঁর হৃদয়ে জাগছিল আনন্দের অনাবিল শিহরণ। বাড়িতে পৌছার পরই উম্মে রাবিয়াকে বললেন, আমি রাবিয়াকে এমন এক উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন দেখেছি, যেখানে কম লোকই পৌছুতে সক্ষম। উম্মে রাবিয়া বললেন, আপনার কাছে ত্রিশ হাজার দিনার বড় না এই মর্যাদা, যা আজ রাবিয়া অর্জন করেছে? ফররুখ বললেন, আল্লাহর কসম, সারা দুনিয়ার চেয়েও এটা আমার কাছে বেশি প্রিয়। উম্মে রাবিয়া বললেন, আপনার ত্রিশ হাজার দিনার আমি রাবিয়ার শিক্ষা-

দীক্ষায় ব্যয় করেছি। আপনি কি এতে আনন্দিত? ফররুখ বললেন, হ্যাঁ, আমি আনন্দিত। আল্লাহ পাক তোমাকে আমার পক্ষ থেকে রাবিয়ার পক্ষ থেকে ও মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দিন।

'এই তো সেই মহীয়সী, কল্যাণের আধার আদর্শ মা! যুগে-যুগে পৃথিবী যাঁদের থেকে লাভ করেছে কল্যাণ ও সওগাতের অফুরন্ত সম্ভার! আজকের এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ে বড় প্রয়োজন এমন একজন আদর্শ মায়ের।

যারযুনা একজন মহীয়সী জননীর কথা

পৃথিবীর অনেক বড়-বড় ঘটনা ও ইতিহাসের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে নারীরই থাকে প্রধান ভূমিকা। পুরুষ রণাঙ্গনে তরবারি উচিয়ে শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে ছিনিয়ে আনে একের পর এক বিজয়। তার আড়ালে প্রধান ভূমিকা পালন করে যে নারী, তার কথা ও অবদান ইতিহাসের পাতায় তেমন গুরত্ব পায় না। তাদেরই একজন আহমদ শাহ আবদালির মহীয়সী মাতা। নাম যারযুনা। অত্যন্ত দীনদার মহিলা তিনি। অন্তরে ইসলাম ও ঈমানের প্রতি দারুণ আকর্ষণ ছিল তার। যখন হিন্দুস্তানে মারাঠা বাহিনী বিজয় লাভ করল, তখন তারা আক্রমণ চালাতে চালাতে একেবারে উটক পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সে সময় কান্দাহারে একটি মজবুত কেল্লা বানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ-সংবাদ শুনে ভিতর থেকে আহমদ শাহ আবদালিকে ডাকা হল। আহমদ শাহ আবদালি উঠে দাঁড়ালেন। তখন তার শ্রদ্ধেয় মাতা রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আহমদ শাহকে দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। আহমদ শাহ আবদালি জিজ্ঞাসা করলেন, আম্মা! আপনি কেন আমার উপর অসন্তুষ্ট? তখন মাতা রাগান্বিত হয়ে কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে বললেন, আমি কি তোমাকে এজন্য জন্ম দিয়েছি যে, তুমি মারাঠাদের ভয়ে দূর্গ নির্মাণ করবে? আফসোস! যদি আমি তোমাকে দুধপান না করতাম! লালন-পালন না করতাম!

আহমদ শাহ আবদালি বললেন, আম্মা আমি ক্ষমা চাচ্ছি। এরপর আহমদ শাহ আবদালি হিন্দুস্তানের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং মারাঠাদের সঙ্গে কয়েকটি যুদ্ধ করলেন। অবশেষে পানিপথের রণাঙ্গনে মারাঠাদের দর্প চিরতরে বিচূর্ণ করে দিয়ে ভারতবর্ষে ইসলামের যাত্রাকে পুণরায় বেগবান করেন।

ইতিহাসে যে সমস্ত মুজাহিদের নাম চির উজ্জ্বল তাদের পিছনে কোনো না কোনো মায়ের প্রেরণা নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যায়। হায়! তেমন মা আবার কবে

আসবে! কবে আবার তার সন্তানেরা ইসলামের পতাকা নিয়ে বীরদর্পে এগিয়ে যাবে!

সাঈদা রহ. সমকালীন নারীদের আদর্শ

চিরসত্য ও শাশ্বত ধর্ম ইসলাম। হক ও বাতিলের প্রভেদকারী ধর্ম ইসলাম। ইসলামের খাতিরে ভাই ভাইয়ের শত্রু হয়, ছেলে পিতার খুনপিয়াসী হয়ে ওঠে। আবার শত্রু বন্ধুতে পরিণত হয়। ইসলামের স্বর্ণযুগে এরূপ উপমা ভুরিভুরি পাওয়া যায়। এমনকি এখনো ঘটছে এমন অনেক কাহিনী। আমরা তার কটিরই-বা খবর রাখি!

এমনি একটি ঘটনা সাম্প্রতিক আফগান-কন্যা বীরপত্নী সাঈদার জীবনে ঘটেছে। বাড়ি আফগানিস্তানের নাগমান প্রদেশের এক প্রত্যন্ত গ্রামে। সাঈদা ছিল সচ্ছল পরিবারের আদরের কন্যা। রূপে, গুণে আর দশজনকে হার মানায় সে। তবে এরমধ্যে সবচেয়ে বড় গুণটি হল তাঁর ঈমানি জজবা। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। দীনের জন্য সবকিছু কোরবানি করতে প্রস্তুত।

তখন রাশিয়ানরা আফগানিস্তানের নিরীহ মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করত। হত্যা ছিল তাদের মজার খেলা। সাঈদার ভাই শের আফজাল একজন কট্টর কমিউনিস্ট। রাশিয়ান লাল-বাহিনী আফগানিস্তানে আসার পর সে নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যায় অগ্রগামী ছিল।

খুনপিয়াসী রুশ বাহিনী একদিন বড় ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করল। অসংখ্য নারী-পুরুষ ও নিষ্পাপ শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করল। জায়গায় জায়গায় শুধু লাশ আর লাশ। চারদিকে শুধু রক্তের ছাপ। নরদমা দিয়ে পানির বদলে প্রবাহিত হতে লাগল রক্তের স্রোত।

বিধ্বস্ত ঘরগুলো থেকে ধোঁয়া উড়ছিল। নিষ্পাপ মা-বোনদের রোনাজারিতে আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। সে এক করুণ দৃশ্য!

রাতের প্রথমভাগে শের আফজাল একদল কম্যুনিস্ট সেনা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। বোন সাঈদা তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। তাঁর মাথায় এক অভিনব বুদ্ধি খেলে গেল। এই তো সময় প্রতিশোধ নেবার। সাঈদা রুশ ও কম্যুনিস্ট সেনাসদস্যদের দারুণ আপ্যায়ন করল। তাদেরকে বলল, তোমরা খুব ভালো কাজ করেছ। দুশমনদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছ। তোমাদের

আক্রমণে আমি যারপরনাই খুশি হয়েছি। এখন আমার অন্তর ঠাণ্ডা হয়েছে। আমি চাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে যাব। শত্রুর বিরুদ্ধে তোমাদের সহায়তা করব।

শের আফজাল ও অন্য কমিউনিস্ট সেনারা খুব সন্তুষ্ট হল। যাক, সাঈদা তাহলে এবার আমাদের দলে এল। ওর পুরাতন চিন্তার পরিবর্তন ঘটেছে। সাঈদা বলল, তবে আমার একটি আবদার। আজ রাত্রিটা তোমরা আমার গরিবালয়ে থেকে যাবে। মন ভরে তোমাদের আপ্যায়ন করব আমি।

রুশরা আরও আনন্দিত হল। সাঈদার ভাই ও অন্যান্য রুশ সেনা তাঁর নিমন্ত্রণ কবুল করে নিল। তারা রাত্রে সেখানেই অবস্থান করল।

শুরু হল খাবার আয়োজন। সে খুব খাতির-তোয়াজ করল তাদের। এবার মদের পালা। চলল অনেকক্ষণ। নাচ-গান তো আছেই। এ-ছাড়া ওদের রাত কাটে কিভাবে? ধীরে-ধীরে সবাই নেশার আমেজে ঘুমিয়ে পড়ল। সাঈদা অনুভব করল নেশায় তারা এখন অচেতন। ধীরে-ধীরে ধারালো তরবারি দিয়ে এক রুশ সৈনিকের দেহ থেকে ধর আলাদা করে ফেলল। এরপর আরেকটি। এভাবে সব সৈনিককে হত্যা করল। বীরাঙ্গনা সাঈদা অবশেষে আপন ভাই শের আফজালকে জাগিয়ে তুলল।

ভাইজান, তোমার সঙ্গীদের পরিণতি একবার দেখে নাও। সে তাদের সবাইকে দেখে চমকে উঠল। একি, এরা রক্তাক্ত কেন? যেন রক্তের বন্যা বইছে এখানে। চিৎকার দিয়ে উঠল শের আফজাল।

আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মেয়ে সাঈদা ভাইকে বলল, ভাইজান! এতো চেঁচামেচি করো না। তোমার অবস্থাও তাই হবে যেমন তাদের দেখছ। সঙ্গীদের লাশের মধ্যে তোমার মৃত অবয়বটা একবার দেখে নাও। নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যার পরিণতি শেষবারের মতো দেখে নাও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেইদিন অবশ্যই আসবে যখন সকল রাশিয়ান সেনা ও কমিউনিস্টদের এমন পরিণতি হবে, যা এখন দেখছ। মুসলমানের পবিত্র খুন বৃথা যাবে না। যেতে পারে না। আফগানরা স্বাধীনতার মুখ দেখবেই। স্বাধীন সূর্য এই পবিত্র মাটিতে উঠবেই। শহীদদের রক্ত দিয়ে লেখা হবে স্বাধীনতার ইতিহাস। তবে সেইদিন তুমি থাকবে না। ভাই শের আফজাল বোন সাঈদার ঈমানি জজবা দেখে ভড়কে গেল। ক্ষমা প্রার্থনা করল। কিন্তু বীরাঙ্গনা সাইদা তাকে ক্ষমা করবে কেন?

আমি তোমাকে ক্ষমা করলেও আমার নিষ্পাপ শিশু সন্তান, নারী-পুরুষের তাজা রক্ত তোমাকে ক্ষমা করবে না। আমি তাঁদের হয়ে আজ তোমার থেকে

প্রতিশোধ নিচ্ছি। এই বলে সাইদা নিজ ভাইকে তরবারির এক আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল কমিউনিস্ট আফজাল। ঈমানি জজবা ও দেশপ্রেমের এক জ্বলন্ত উপমা পেশ করল সাঈদা।

বীরাঙ্গনা সেই মেয়েটি রুশদের হেলিকপ্টারের নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন। তবে কিয়ামত পর্যন্ত আগত নারীদের জন্য রেখে গেলেন এক উজ্জ্বল উপমা।

একজন আদর্শ মা

আল্লামা ইবনে জাওজি রহ. একজন মহীয়সী নারীর জিহাদি জজবা ও দীনের জন্য তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষার একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে আগত সকল মুসলিম নারীর জন্য রয়েছে অনুপম আদর্শ।

ইমাম জাওজি রহ. বলেন, আবু কুদামা নামে মদীনা মুনাওয়ারায় একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় জিহাদে কাটিয়েছেন। জিহাদি প্রেরণায় তিনি ছিলেন উজ্জীবিত।

একবার তিনি মসজিদে নববীতে বসে জনসাধারণের সঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত ছিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন বলল, হুযুর! জিহাদের ময়দানে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে আশ্চর্যজনক একটি কাহিনী আমাদের বলুন।

আবু কুদামা রহ. বলেন, তবে শোন। রাক্কা নামক এলাকায় আমাদের জন্য জিহাদের অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া ইত্যাদি ক্রয় করতে গেলাম।

একদিন ফুরাত নদীর তীরে বসেছিলাম। এমন সময় একজন মহিলা আমার নিকট এসে বলল, আবু কুদামা! আমি আপনার ব্যাপারে শুনতে পেয়েছি, আপনি জিহাদি বক্তৃতা করেন। জিহাদের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন। আর নিজেও সর্বদা জিহাদে লিপ্ত থাকেন।

আমাকে আল্লাহ তাআলা লম্বা-লম্বা চুল দান করেছেন। আমি আমার উপড়ানো চুল দ্বারা একটি রশি পাকিয়েছি। এবং এগুলোর সঙ্গে মাটি মিশিয়ে নিয়েছি যাতে চুলের বেপর্দা না হয়। আপনি আমার এই রশিটি নিয়ে যান। আপনি যখন জিহাদের ময়দানে শত্রুদের মুখোমুখি হবেন, প্রচণ্ড লড়াই শুরু হবে, তলোয়ারে তলোয়ারে ঘর্ষণ শুরু হবে, তীর নিক্ষেপ শুরু হবে, বর্শা নিক্ষেপ শুরু হবে, তখন আপনি এই রশিটিকে ঘোড়ার গলায় ঝুলিয়ে নিবেন। এর দ্বারা সহায়তা নিবেন। যদি আপনার প্রয়োজন না হয় তবে যাঁর প্রয়োজন

হবে তাঁকে রশিটি দিয়ে দিবেন। আমি চাই আমার চুলগুলোতে জিহাদের ধুলোবালি লাগুক, যা আমার পরকালে কাজে আসবে।

আমি একজন বিধবা। আমার স্বামী জিহাদে শহীদ হয়েছেন। আমার পুরো খান্দান জিহাদে শরিক হয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন। আমার ওজরের কারণে আমি জিহাদে যেতে পারছি না। তাই দয়া করে আমার এই চুলগুলো নিয়ে যাবেন যাতে আমি জিহাদের সাওয়াব অর্জন করতে পারি।

মহিলাটি আবারও বলল, হে আবু কুদামা! আমার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনুন। আমার স্বামী যখন শহীদ হন তখন তাঁর একজন ছেলে রেখে যান। সে কুরআনের হাফেজ। তীরন্দাজিতে সিদ্ধহস্ত। ঘোড়সওয়ারিতেও খুব দক্ষতা অর্জন করেছে। এভাবে জিহাদের খুটিনাটি অনেক কৌশল সে রপ্ত করে নিয়েছে। তাঁর বয়স পনেরো হয়েছে। এখন সে জমিনে কাজ করতে গিয়েছে। যখন সে ফিরে আসবে আমি তাঁকে আপনার নিকট পাঠিয়ে দেব। আমি এই নওজোয়ান ছেলেকে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি এবং পরকালের মুক্তির জন্য আপনার নিকট পেশ করব। দয়া করে আপনি আমার এই ক্ষুদ্র হাদিয়াটুকু গ্রহণ করবেন। আপনাকে দীনে ইসলামের ইজ্জত ও গৌরবের দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে এই সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করবেন না।

শায়খ আবু কুদামা রহ. বলেন, আমি মহিলার কাছ থেকে চুলের রশিটি নিয়ে নিলাম। অনুভব করলাম, সত্যিই এটা চুল দ্বারা বানানো হয়েছে। মহিলাটি আমাকে বলল, আপনি আমার সামনেই এই রশিটি আপনার সরঞ্জামাদির সঙ্গে হেফাজত করে নিন, যেন আমার আত্মা তৃপ্ত হয়।

আমি রশিটি তাঁর কথামত হেফাজত করলাম এবং সাথীদের নিয়ে 'রাক্কা' হতে বের হয়ে এলাম।

আমরা যখন মাসলামা ইবনে আবদুল মালিকের দূর্গের নিকট পৌঁছলাম তখন পিছন থেকে একজন অশ্বারোহীর চিৎকার কানে এল। সে বলছিল, আবু কুদামা! থামুন। আমরা থেমে গেলাম। দেখলাম, একজন অশ্বারোহী অশ্ব হাঁকাতে হাঁকাতে ছুটে আসছে। এসেই সে আমার সঙ্গে মুসাফাহা-মুয়ানাকা করে বলল, আল্লাহর শোকর, তিনি আমাকে আপনার সান্নিধ্য হতে বঞ্চিত করেন নি। সে কাপড় দিয়ে তার চেহারা ঢেকে রেখেছিল। আমি তাকে বললাম, মুখোশ খোল, যেন আমি দেখে নিতে পারি। যদি জিহাদ তোমার উপর ফরজ হয় আমি তোমাকে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দেব। অন্যথায়

তোমাকে ফেরত পাঠব।

সে তাঁর চেহারা খুলল। দেখতে পেলাম চাঁদের ন্যায় সুন্দর সুদর্শন একজন কিশোর আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। আমি তাকে বললাম, বেটা! তোমার পিতা কি জীবিত আছেন?

সে বলল, না, আমার পিতা জীবিত নেই। তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। আমি আমার পিতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই যাচ্ছি। হয়ত আল্লাহ্ তাআলা আমাকেও শাহাদাতে ধন্য করবেন।

তোমার মাতা জীবিত আছেন?

হ্যাঁ, মা জীবিত আছেন।

আমি বললাম, প্রথমে তোমার মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এস। তিনি যদি অনুমতি দেন তবে তো ঠিক আছে। অন্যথায় তুমি তোমার মায়ের নিকট থেকে যাবে। কারণ এ-মুহূর্তে জিহাদ ফরজে আইন নয়। আর মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত।

ছেলেটি বলল, হে আবু কুদামা! আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?

আমি বললাম, না। তোমাকে চিনব কিভাবে? তোমাকে তো কখনও দেখি নি মনে হচ্ছে।

নওজোয়ান বলল, আমি ওই মহিলার সন্তান যে চুলের রশি আপনার নিকট অর্পণ করেছেন। আপনি ভুলে গেলেন কেন? আমি ইনশাআল্লাহ শহীদ হব। আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে জিহাদে নিয়ে চলুন। আমি কুরআনের হাফেজ, তীরন্দাজ ও ঘোরসওয়ারিতে আমার এলাকায় আমার কোনো জুটি নেই। আমি ইসলামের অনেক মাসআলা সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করেছি। ছোট বলে আমাকে অবহেলা করবেন না। আমার মা আমাকে শপথ করিয়েছেন, আমি যেন জীবিত ঘরে ফিরে না যাই। আমার মা আমাকে বলেছেন, বেটা! যখন কাফেরদের সঙ্গে লড়াই শুরু হবে তখন তুমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না বরং শাহাদাতের আশায় সম্মুখে এগিয়ে চলবে। জীবনকে আল্লাহর রাহে সোপর্দ করে দিবে। আর জান্নাতে আল্লাহর সান্নিধ্য ও তোমার পিতার পড়শি হওয়ার জন্য দুআ করবে। আল্লাহ তাআলা তোমাকে যখন শাহাদাতে ধন্য করবেন, তুমি আমার জন্যও সুপারিশ করো। কেননা আমি শুনেছি, একজন শহীদ তাঁর পরিবারের সত্তরজনের জন্য সুপারিশ করতে পারে। তারপর আম্মাজান আমাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরেছেন এবং

আকাশের দিকে তাকিয়ে এভাবে দুআ করেছেন, হে পরওয়ারদিগার! হে আমার মুনিব! এ আমার কলিজার টুকরা, নয়নমণি, হৃদয়ের ফুল, আমার জান। আমি একে তোমার দীনের খেদমতে পেশ করছি। তুমি তাকে কবুল করে নাও।

শায়খ আবু কুদামা বলেন, আমি তার কথা শুনে খুব কাঁদলাম। কারণ ছেলেটি সুদর্শন। নওজোয়ান। আর তাঁর মা না-জানি কত ব্যথা হৃদয়ে চেপে রেখেছেন। কত বিশাল ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন।

যুবক বলল, চাচাজান আপনি কাঁদছেন কেন? যদি আমার অল্প বয়সের কারণে কেঁদে থাকেন, তবে মনে রাখবেন ছোটদেরকেও আল্লাহ তাআলা নাফরমানির কারণে শাস্তি দিয়ে থাকেন।

আমি বললাম, তোমার আম্মুর কারণে কাঁদছি। তোমার শাহাদাতের পর তোমার অসহায় মা কিভাবে জীবন কাটাবেন।

আমরা সামনে অগ্রসর হতে লাগলাম। রাতভর সফর হল। রাত শেষে ভোর হল। আমরা সফর করতেই লাগলাম। ছেলেটি আল্লাহ তাআলার জিকিরে মশগুল ছিল। এভাবে দ্বিতীয় দিনও আমাদের সফর অব্যাহত থাকে। আমি গভীরভাবে লক্ষ করলাম, ছেলেটি ঘোরসওয়ারিতে খুবই দক্ষ। অন্যান্য জিহাদি প্রশিক্ষণে ছিল অন্য দশজনের তুলনায় অগ্রগামী।

পরেরদিন সন্ধ্যাবেলায় আমরা শত্রু-এলাকায় প্রবেশ করি। আমরা সেখানে ছাউনি ফেললাম। আমরা ছিলাম রোযাদার। ছেলেটি আমাদের জন্য ইফতারের আয়োজন করছিল। লাগাতার সফর এবং জেগে থাকার কারণে ছেলেটি ক্লান্ত ছিল। ফলে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর লক্ষ করলাম ছেলেটি মুচকি হাসছে। দারুণ সুন্দর লাগল তার সেই পবিত্র হাসি। আমি সাথীদের ডাকলাম। তারাও দৃশ্যটি দেখে অভিভূত হল।

ঘুম থেকে জেগে উঠলে আমি তাকে বললাম, প্রিয় বৎস! আমি তোমাকে এই মাত্র হাসতে দেখলাম। তুমি ঘুমে হাসছিলে কেন বল তো বাবা?

নওজোয়ান বলল, আমি একটি বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখলাম। সে কারণে হয়ত হাসছিলাম। স্বপ্নটি ছিল এ রকম- সবুজ-শ্যামল, নয়নকাড়া একটি স্থানে আমি পৌছলাম। চারদিকে সবুজ আর সবুজ। ফুলে ফুলে ভরে আছে আশপাশ। মনোলোভা সেই দৃশ্য। আমি তাতে বিচরণ করছিলাম। এবং খুবই আনন্দ অনুভব করছিলাম। চলতে-চলতে সামনে একটি নয়নাভিরাম অট্টালিকা

দেখতে পেলাম। সবুজ গম্বুজে অট্টালিকাটি সত্যিই অবাক করার মতো, যা হীরা-মণি-মুক্তা এবং স্বর্ণ-রূপায় খচিত। দরজাটি ছিল চমকানো স্বর্ণের, যা সুনিপুণভাবে পর্দাবৃত। দরজার পর্দাটি ধীরে-ধীরে উন্মুক্ত হল। দেখলাম, কয়েকজন মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েগুলো চাঁদের ন্যায় ঝলমল করছিল। তাঁরা সবাই মিলে আমাকে মোবারকবাদ দিল। আমি তাদের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে একজনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। তখন সে আমাকে বলল, এত জলদি করবেন না। এখনো আপনার সময় আসে নি। আমরা আপনার স্ত্রী নই। আমরা আপনার স্ত্রীর বাঁদীমাত্র। আপনার স্ত্রীর নাম মারজিয়া। আপনার উপর আল্লাহ্ রহম করুন। আপনি আরও সম্মুখে অগ্রসর হোন।

আমি গভীর আবেগ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে লাগলাম। দেখলাম এ-প্রাসাদে একটি কামরা রয়েছে, যা অনেকটা উঁচু স্থানে এবং সম্পূর্ণ স্বর্ণের তৈরী। এর ভিতরে অতি মূল্যবান জমরুদ পাথরের একটি খাট রয়েছে, যার পায়াগুলো সাদা চকচকে। আমি নয়নকাড়া এই শোভা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। দেখতে পেলাম, তার মধ্যে অতি সুন্দরী একজন যুবতী বসে আছে। তাঁর রূপ-যৌবনের কোনো উপমা হয় না। মনে হয় যেন সদ্য প্রস্ফুটিত একটি শিশির-ভেজা গোলাপ। আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসছে। আমি তাঁর দিকে অগ্রসর হলে সে বলল, *স্বাগতম আমাদের এই ভুবনে। তবে এখনো তোমার* সময় হয় নি। হ্যাঁ, আগামীকাল দ্বিপ্রহরের সময় তোমার আমার মিলন হবে।

শায়খ বলেন, আমি যুবককে বললাম, তুমি দারুণ সুন্দর ও মূল্যবান স্বপ্ন দেখেছ। তুমি সত্যিই ভাগ্যবান।

তারপর আমরা রাতভর যুবকের স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করলাম। কিছুতেই ফল মিলাতে পারলাম না।

পরদিন।

প্রত্যুষে আমরা অযু-ইসতেনজা সেরে আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়ালাম। নামায শেষে কায়মনোবাক্যে সকলেই মহান প্রভুর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলাম। এবং সারিবদ্ধ হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলাম। ইতোমধ্যে ঘোষণা হল।

يا خيل الله اركبي وفى الجنة ارغبي انفروا خفافا وثقالا

হে আল্লাহর সওয়ারিগণ, সওয়ার হও। জান্নাতে অগ্রসর হও।

তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়, তোমরা যদি স্বল্প কিংবা অধিক সরঞ্জামের মালিকও হও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রুবাহিনী আমাদের দৃষ্টিগোচর হল। তারা স্রোতের ন্যায় ধেয়ে আসতে লাগল। সংখ্যায় তাঁরা আমাদের তুলনায় ছিল অনেক বেশি। সমুদ্রের ন্যায়, যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিল।

শুরু হল হামলা। পাল্টা হামলা। মরণপণ লড়াই। আমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম এ-নওজোয়ান কাফের বাহিনীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে শত্রুদের ভিতরে ঢুকে পড়ল। কাফেরদের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে তাদের তছনছ করতে লাগল। ওদের কয়েকজন বাহাদুরকে সে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দিল। আর বহুজনকে ধরাশায়ী করে ফেলল। আমি যুবকটির এলোপাথাড়ি হামলা দেখে তাঁর নিকট গেলাম এবং তাঁর লাগাম ধরে বললাম, বেটা! তুমি এবার ফিরে এস। তুমি নবীন। অনভিজ্ঞ। যুদ্ধের কলা-কৌশল সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানের অভাব রয়েছে।

নওজোয়ান বলল, চাচাজান আপনি কি কুরআনের এই আয়াতটি পড়েন নি,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ

অর্থ- হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কাফেরদের সঙ্গে মুখোমুখি সজ্ঘর্ষে লিপ্ত হবে, তখন তোমরা পিছপা হবে না। –সূরা আনফাল: ১৫

চাচাজান, আপনি কি চান আমি পিছপা হয়ে জাহান্নামের উপযোগী হই?

অকস্মাৎ একদল কাফের এসে আমাদের ঘিরে ফেলল। আমরা তাদের বেষ্টনীতে পড়ে উপর্যুপরি হামলা করতে লাগলাম। এক পর্যায়ে আমি তাদের বেষ্টনী হতে বেরিয়ে পড়লাম। এভাবেই আমরা একে অপর থেকে পৃথক হয়ে গেলাম। কাফেরদের এই ঝটিকা আক্রমণটি এতই প্রবল ছিল যে, এতে আমাদের অনেক সাথী শাহাদাত বরণ করল। এভাবেই সমাপ্ত হল একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।

তারপর আমি আমার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সমগ্র রণক্ষেত্র ঘুরে দেখতে লাগলাম। চারদিকে লাশ আর লাশ। কিছুক্ষণ আগে রক্তের বৃষ্টি হয়েছে যেন এই জায়গাটিতে। জায়গায় জায়গায় শহীদের দেহ মাটির সঙ্গে মিশে আছে।

ধুলো-মাটিতে চেনা যাচ্ছে না। অনেকক্ষণ পর। হঠাৎ দূরে একটি ঘোড়ার নিচে পিষ্ঠ হয়ে পড়ে থাকা এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। আমি দৌড়ে তাঁর নিকট পৌঁছে দেখি সে আর কেউ নয়। আমার সেই প্রিয় কিশোরটি। আরও নিকটে পৌঁছে দেখি ক্ষীণ আওয়াজে সে কি যেন বলছে।

রক্ত আর ধুলো-বালিতে মিশে একাকার হয়ে গেছে তাঁর সুন্দর চেহারা। কান পেতে শুনতে পেলাম সে বলছে, আমাকে আমার চাচা আবু কুদামার নিকট নিয়ে চল।

আমি বললাম, বেটা! আমিই আবু কুদামা!

নওজোয়ান বলল, চাচাজান, আমার স্বপ্ন সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আমি জান্নাতের নাজ-নেয়ামত এবং হুর-গোলামদের দেখতে পাচ্ছি। আমি চললাম। আপনি আমার জন্য দুআ করবেন চাচাজান!

আমি বললাম, বেটা! কিয়ামতের কঠিন দিবসে তোমার সুপারিশে আমাকেও স্মরণ রেখ।

সে বলল, চাচাজান আপনার মতো মহান ব্যক্তিকে কিভাবে ভুলতে পারি?

আমি তাঁর চেহারার দিকে ঝুকে পড়লাম। তাঁর কপালে চুমু খেলাম। এবং আমার চাদর দিয়ে তাঁর চেহারা থেকে মাটি ও রক্ত মুছতে লাগলাম।

নওজোয়ান বলল, আপনার মতো দয়াশীলকে ভোলা যায় না। আপনি আপনার কাপড় দিয়ে আমার রক্ত মুছছেন কেন? আমার কাপড়ই এর জন্য বেশি উপযোগী।

তারপর সে আবার ক্ষীণ আওয়াজে বলল, চাচাজান, এ খুন মুছবেন না। আমি এ-খুন নিয়ে আমার প্রভুর দরবারে হাজির হতে চাই। আর আপনাকে যে হুরের কথা বলেছিলাম সে এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আমার রূহ বের হওয়ার অপেক্ষায়। আর সে আমাকে বলছে, আমি তোমার সাক্ষাতের জন্য অধির অপেক্ষমাণ প্রিয়তম। আর দেরি করো না। দ্রুত আমার নিকট চলে এস।

হে চাচাজান! আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, যদি আপনি সুস্থ শরীরে দেশে ফিরে যান, তাহলে আমার এই রক্তমাখা কাপড়গুলো আমার মায়ের নিকট পৌঁছে দিবেন। আর বলবেন, আপনার ছেলে আপনার অসিয়ত পুরোপুরি আদায় করেছে। শত্রুদের মোকাবেলায় পিছপা হয় নি। জাতির সঙ্গে বেঈমানি করে নি। আর আপনি তাঁকে আমার সালাম দিয়ে বলবেন, আল্লাহ

তাঁর উপঢৌকন কবুল করেছেন। চাচাজান! আমার ছোট একটি বোন আছে। বয়স দশ বছর হবে। সে আমাকে খুব মুহাব্বত করে। আমি যখনি ঘর হতে বের হতাম সে আমাকে বিদায় জানাত। আবার যখনি ঘরে ফিরতাম সবার আগে সেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করত। সালাম জানাত। আমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করত। এবার শেষবারের মতো যখন ঘর হতে বের হই সে আমাকে বলল, ভাইজান, কোথায় যাচ্ছেন? জলদি ফিরে আসবেন। আপনাকে ছাড়া আমার কষ্ট হবে।

আমার এই দুঃখিনী বোনটির সঙ্গে যখন আপনার সাক্ষাৎ হবে, তাকে বলবেন, তোমার ভাই বলেছে, কিয়ামতে সাক্ষাৎ হবে ইনশাআল্লাহ।

কথাগুলো বলে নওজোয়ান কালেমা শাহাদাত পড়ে নিল। তারপর নশ্বর এই পৃথিবী ছেড়ে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেল। আমরা তাঁকে এ-কাপড়েই দাফন করলাম। তারপর আমরা ফিরে এলাম।

আমরা যখন রাক্কায় ফিরে এলাম তখন আমি প্রথমেই ওই যুবকের বাড়ি গেলাম। দেখি ঐ যুবকের মতো সুন্দর একজন মেয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আর যুদ্ধ-ফেরত লোকেদেরকে তাঁর ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করছে। সবাই নেতিবাচক উত্তর দিয়ে চলে যাচ্ছে।

আমি যখন তাঁর দিকে অগ্রসর হলাম সে আমাকে বলল, চাচাজান! আপনি আমার ভাইটির কোনো সংবাদ জানেন? আপনি কি রণাঙ্গন থেকে এসেছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি রণাঙ্গন হতে মাত্রই ফিরে এসেছি।

মেয়েটি বলল, আপনি কি আমার ভাইয়ার কোনো সংবাদ দিতে পারবেন, আমি খুব... সে চিৎকার দিয়ে উঠল। ভাইয়ের বিরহ বেদনা সহ্য করতে পারছিল না সে।

আমি আমার কান্না চেপে রাখলাম। আর মেয়েটিকে বললাম, যাও তোমার আম্মুকে গিয়ে সংবাদ দাও, আবু কুদামা এসেছে।

মহিলা আমার এই কথোপকথন শুনলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘর হতে বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, আবু কুদামা আপনি আগে বলুন, আপনি আমাদের জন্য সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন না দুঃসংবাদ? আমি বললাম, আপনি আগে সুসংবাদ এবং দুঃসংবাদের ব্যাখ্যা বলুন।

তিনি বললেন, আমার ছেলে যদি সুস্থ ও নিরাপদে ফিরে আসে, তবে এটা

হবে আমার জন্য দুঃসংবাদ। আর যদি আমার কলজে-ছেঁড়া ধনকে আল্লাহ তাআলা শাহাদাতে ধন্য করেন তবে এটা হবে আমার জন্য সুসংবাদ।

আমি বললাম, আপনাকে অসংখ্য মোবারকবাদ। যদি তাই হয় তাহলে আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ তাআলা আপনার হাদিয়া গ্রহণ করেছেন। আপনার ছেলে রণাঙ্গনে শাহাদাত বরণ করেছে।

তিনি আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বললেন, আপনার উপর আল্লাহ তাআলা রহম করুন হে আবু কুদামা! সত্যিই আপনি আমার জন্য এক পরম সুসংবাদ বয়ে এনেছেন। আখেরাতের জন্য এরচেয়ে বড় পুঁজি আমার আর কিছু হতে পারে না। আমার অশান্ত দিল এখন শান্তি লাভ করল।

তারপর আমি ওই নওজোয়ানের সংবাদ তাঁর বোনকে দিলাম। আল্লাহ হাফেজ, কিয়ামতের দিন সাক্ষাৎ হবে। মেয়েটি এই সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে এক চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে পড়ল।

আমি তাঁর শিরায় হাত রেখে দেখলাম, সেও আর ইহজগতে নেই। ভাইয়ের মতো ছোট বোনটিও আলবিদা জানাল এই নশ্বর পৃথিবীকে।

আমি শহীদ নওজোয়ানের রক্ত মিশ্রিত কাপড়খানা তাঁর মায়ের নিকট সোপর্দ করলাম। আমার হৃদয়চিরে চিৎকার বেরিয়ে আসছিল। যেন আমিও শামিল হই তাঁদের কাতারে। কোনো মতে নিজেকে সংবরণ করে ভগ্নহৃদয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম...।

শহীদের মায়ের ধৈর্য দেখে সত্যিই আমি অভিভূত।

একজন আদর্শ মায়ের কারগুজারি

আফগানিস্তান। শুহাদায়ে কিরামের রক্তে সিঞ্চিত ভূমি। আমির আবদুর রহমান খান ছিলেন কাবুলের গভর্নর। তাঁর দাদা আমির দোস্ত মুহাম্মাদের একটি ঘটনা। কাফেরদের মোকাবেলায় তাঁর পুত্রের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন তিনি। দুই তিনদিন পর সংবাদ এল, শাহজাদার পরাজয় আসন্ন। সেনাদের নিয়ে তিনি পিছু হটছেন। আর শত্রুবাহিনী তাকে ধাওয়া করে আসছে। এ-সংবাদ শুনে দোস্ত মুহাম্মাদের মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। লজ্জা, অনুশোচনা, দুঃখে একেবারে ভেঙে পড়লেন তিনি। তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একে তো পরাজয়ের গ্লানি। অন্যদিকে পুত্রের দুর্বলতা। লোকজনের কাছে কিভাবে মুখ দেখাবেন তিনি।

বাদশা ঘরে এলেন। স্ত্রীকে পুত্রের দুর্বলতার কথা বললেন। স্ত্রী সব শুনে বললেন, পুরো ঘটনাই তো মিথ্যা ও অবান্তর।

বাদশা বললেন, গোয়েন্দা রিপোর্ট কিভাবে মিথ্যা হতে পারে?

বেগম বলল, আমি কিছুতেই এই রিপোর্টের সত্যতা স্বীকার করতে পারব না। আমার ছেলে পরাজিত হতে পারে না। পারে না সে রণাঙ্গন হতে পালিয়ে পিছু হটতে।

বেগম সাহেবার কথা অবজ্ঞা করে ঘর হতে বেরিয়ে গেলেন বাদশা। তার পরদিন রণাঙ্গন হতে তাজা সংবাদ এল, প্রথম দিনের সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। বাস্তব ঘটনা হল, তাঁর ছেলে যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরে আসছেন। শুনে বেগম সাহেবা আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন।

বাদশা বেগম সাহেবাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে জানলে তোমার পুত্র পরাজয় বরণ করে নি। সে পিছু হটতে পারে না। তুমি এত দৃঢ়তার সঙ্গে কিভাবে বলতে পারলে?

তোমার নিকট এমন কী প্রমাণ ছিল যার দ্বারা গোটা হুকুমতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলে? বেগম সাহেবা বললেন, তেমন কিছুই না। কেবল আল্লাহ তাআলা আমার ইজ্জত রক্ষা করেছেন। এ এক গোপন রহস্য, যা আমি প্রকাশ করতে চাই না।

অনেক পীড়াপীড়ির পর বেগম বললেন, এ-ছেলে যখন আমার গর্ভে আসে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কোনো সন্দেহযুক্ত খাবার যেন আমার পেটে না যায়। কারণ হালাল খাদ্যের দ্বারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী সন্তান জন্ম লাভ করে। অপরদিকে হারাম খাদ্যের দ্বারা চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। এ-শাহজাদা আমার গর্ভে থাকা অবস্থায় নয় মাস আমি এমন খাদ্য গ্রহণ করি নি, যা হালাল হওয়ার ব্যাপারে সামান্য সন্দেহ থাকতে পারে।

তাই আমি কল্পনাও করতে পারি না। তার চরিত্র খারাপ হতে পারে সুতরাং এমন আখলাকের অধিকারী মানুষের পরিচয় হল, যুদ্ধে গেলে হয়ত শাহাদাত বরণ করবে অন্যথায় বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনবে। এ-দুটো ব্যতীত তৃতীয় কিছু হতে পারে না। সুতরাং আমি কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি আমার ছেলে পিছু হটে আসছে? ময়দান থেকে পলায়ন করে আসছে, আমি কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি বলুন?

তাছাড়া আরও একটি কথা হল, এই ছেলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও কোনো সন্দেহযুক্ত আহার আমি গ্রহণ করি নি যাতে উক্ত হারাম খাদ্যের দ্বারা শরীরে দুগ্ধ সঞ্চার হয়ে এই খাবারের প্রভাব শাহজাদার উপর না-পড়ে। এ-ছাড়াও যখনি আমি তাকে দুধ পান করাতাম আগে অজু করে পাক-পবিত্র হয়ে দুই রাকাত নফল নামায পড়ে নিতাম, যেন শাহজাদার আখলাক-চরিত্র সুন্দর হয়। উন্নত রুচিসম্পন্ন হয়। আর এজন্যই আমি আপনার হুকুমতের সকলের কথা উড়িয়ে দিতে, মিথ্যা ও অবান্তর বলে আখ্যায়িত করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করি নি। আমার বিশ্বাস একটুও বিচ্যুত হয় নি।

ভাগ্যবতী এক নারীর শাহাদাতের হৃদয়বিদারক কাহিনী

২০০০ সালের শীতকাল। চেচনিয়ার আলদী নামক গ্রামে সঙ্ঘটিত হয় একটি হৃদয়বিদারক কাহিনী।

চার বছরের বালক আসলাম তার রক্তাক্ত মাকে ঝাঁকিয়ে জাগানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু তাঁর মা কোনোভাবেই শুনছেন না। আর তার আহত দাদা তারই একপাশে পড়ে ছিল।

তারা মাটির নিচে বাঙ্কারের মতো বানিয়ে তার ভেতর ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকত। আর কখনো বের হওয়ার প্রয়োজন হলে বের হত ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়। কারণ তাদের শহরে অবিরাম গোলা বর্ষণ চলছে।

যখন অল্প সময়ের জন্য গোলা বর্ষণ বন্ধ হত তখন শহরটি যেন মৃতপুরীর মতো নিস্তব্ধ হয়ে যেত। মনে হত এখানে আর কোনো প্রাণী বেঁচে নেই।

আসলামের দাদা বললেন, গোলা আমাদের ঘরেও নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। আমাদের ঘরের দরজাগুলো আগুনে জ্বলছিল। কিন্তু আমি নড়াচড়া করতে পারছিলাম না। কারণ আমি মারাত্মকভাবে আহত। আমার দেহ হতে অবিরত ধারায় রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। আর আমার আদরের পুত্র-বধূর লাশ আমার পাশেই পড়ে ছিল।

ছয় মাসের ছোট্ট শিশু আলী তার মায়ের কোলে পড়ে অবিরাম কাঁদছিল। ছেলেটি অনেকক্ষণ যাবৎ ক্ষুধার্ত তাই মায়ের স্তন হতে দুধ পান করার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। যদি তার কান্না শুনতে পেতে তাহলে অনুভব করতে যে, তাতে বিশ্ববাসীর প্রতি শত ধিক্কার লুকিয়ে রয়েছে। কেন পৃথিবী তাকে তার পানাহারের অধিকার হতে বঞ্চিত করল? মায়ের স্নেহ হতে এত সকালেই

সরিয়ে দিল কেন? আর কেনইবা তাকে এতিম করল?

আসলাম চঞ্চলভাবে ছুটোছুটি করছিল। সে বয়স্ক মানুষের মতো আমাকে বলল, দাদু! কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি। সে ছুটে এসে আমার পাশে দাঁড়াল।

কেঁদো না আলী! অশ্রু বিসর্জন দেওয়া পুরুষের জন্য শোভা পায় না। তুমি এখন বড় হয়েছ। তাই তোমাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, রাশিয়ানরা তোমার মাকে শহীদ করে দিয়েছে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। আসলাম তার ছয় মাসের ভাইটিকে কি বোঝাচ্ছে। যেন তার ভাই তার সব কথাই বুঝছে। অবশেষে শিশু আলী কাঁদতে কাঁদতে দুর্বল ও ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি ধ্বংসস্তুপ হতে মুক্ত হতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু পারলাম না। আমার পা অবাধ্যতা প্রদর্শন করছিল। দুটি পায়ের হাড় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে।

আমি ভগ্নহৃদয়ে এতিম নাতীকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছিলাম, আসলাম সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে। ধৈর্য ধারণ করো। তুমি তো পুরুষ মানুষ।

সে আমাকে বলল, কই আমি তো কাঁদছি না। আমার শুধু মায়ের জন্য কষ্ট হয়। আর এজন্য আমার কান্না পাচ্ছে। আসলে আমি কাঁদছি না। দাদু! তুমি কি আমার কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ?

তখনও তার চোখ হতে অবিরাম অশ্রু ঝরছিল। সে তার মায়ের পা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। এভাবে সে দীর্ঘ সময় ধরে কেঁদেই চলল, আমি তাকে বিরক্ত করলাম না। কেউ তো তার মাকে আর জীবনে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। ছেলেটি তার মাকে ডেকেই চলল। যে তাকে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত করত, আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরত, গালে চুমু খেত, সে যখন খাবার শেষ না করত, যখন দুষ্টুমী করত, তাকে বকুনি দিত। এসব কিছু তার স্মৃতিপটে একের পর এক ভেসে উঠতে লাগল। সে অনুধাবন করছে, এসব কিছু তাঁর জীবনে এখন ঘটনা। মায়ের স্নেহমাখা খুকুমণি ডাক আর শুনতে পাবে না সে। সে তখন মাকে আদরে সোহাগে জড়িয়ে ধরে উঠতে চাইল। আর সিংহ শাবকের ন্যায় বিলাপ করতে লাগল।

একটি ছোট্ট শিশু যে তার জীবনের সুখের দিনগুলো হারাতে শুরু করেছে। বিনিময়ে বড় বড় দুঃখ তার জীবনের সঙ্গী হতে চলছে।

একে একে চারদিন অতিবাহিত হল। আমরা ভূগর্ভস্থ বাড়িতেই অবস্থান করতে লাগলাম। পুরোপুরি দিনের আলো হতে বঞ্চিত থেকে সময় কাটাতে লাগলাম।

ছোট্ট আলী সেই যে ঘুমিয়েছে আর জাগল না। ক্ষুধার তাড়নায় একসময় এ-পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেল ওপারে। আসলাম পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল। সে দুঃখযন্ত্রণায় কাতর হয়ে প্রলাপ বকছিল। আমিও তাকে কোনো ধরনের সাহায্য করতে পারলাম না। আমার চোখ হতে অবিরাম অশ্রু ঝরছিল।

আমি তো চিন্তা করতে পারছিলাম না, যেই চিন্তাকেই পুঁজি করে বাঁচার ক্ষীণ চেষ্টা করতাম। কিন্তু এ শিশুর কি অবস্থা হবে? সে কিসের উপর ভর করে বাঁচার আশা করবে? আমার দেমাগে শুধু এসব প্রশ্নই খেলে যেতে লাগল।

যখন বোমা বর্ষণ শেষ হল, লোকজন আশ্রয়স্থল হতে বের হতে লাগল। তারা দেখল, তাদের গ্রামবাসী, আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে অনেকেই এই পৃথিবীকে আলবিদা জানিয়ে চলে গেছে। দিনের আলো দেখার সৌভাগ্য তাদের আর কখনো হবে না।

আমার পুত্রবধূ, নাতী আলী তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। মৃত্যুর বিভীষিকায় আচ্ছন্ন ছিল প্রতিটি ঘর। কান্নার চাপা গুঞ্জন ভেসে আসছিল চারদিক হতে। মাতমের হা-হুতাশ ইথারে ইথারে ভাসছে। অশ্রু ঝরছিল প্রতিটি চেচেন মা-বোনের চক্ষু হতে। সেদিন হতে আমার চক্ষু থেকে অশ্রু কখনও শুকায় নি।

দাদু, তুমি কাঁদছ কেন? আমি বড় হব। আমি অবশ্যই যুদ্ধে যাব এবং আমি আমার ছোট ভাই ও মায়ের হত্যার প্রতিশোধ নেব।

আমি আসলামের দিকে তাকালাম। আর ভাবলাম, যুদ্ধ এ ছোট্ট শিশুটির জীবনে কি আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়ে গেছে। তার এতটুকু জীবনে কি করুণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল। অনাগত দিনগুলো তাঁর জীবনে কি প্রত্যাশা নিয়ে হাজির হবে?

হযরত আসমা রাযি.: অসীম সাহসী এক নারী

নিঝুম রাত। চারদিক গভীর নিস্তব্ধতায় ছেয়ে আছে। দিগন্ত বিস্তৃত বালু সাগরের মাঝে বসন্তের সজীবতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট্ট নগরী মক্কাকে

আপন করে নিয়েছে আকাশের চাঁদ। তারকারাজি অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছে পৃথিবীর আয়োজন। সমগ্র মক্কা নগরী ঘুমে বিভোর। কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই, নেই কোনো হাঁক-ডাক। তবে জেগে আছে শুধু একদল ঘাতক কাফের। একটি জঘন্য রক্তপাত, একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের উন্মাদনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের চারপাশে ওঁত পেতে আছে তারা।

তাদের দাবি সকল ফেতনার মূল হল এই মুহাম্মাদ! অধিকার আধিপত্য বিস্তার করতে গভীর ষড়যন্ত্র করছে সে। পূর্বপুরুষদের চিরচেনা ধর্মের পরিবর্তে এক নতুন ধর্মের প্রতি আহ্বান করছে। তাঁর যাদুমাখা কথামালা সমাজের কিছু লোককে তাঁর দলে ভিড়াচ্ছে। বংশের মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টি করছে অহরহ। সুতরাং তাঁকে দুনিয়া থেকে চিরতরে সরিয়ে না দিলে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করতে হলে এরচেয়ে সুষ্ঠু সমাধান আর হতে পারে না।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহীর মাধ্যমে তাদের সকল আয়োজনের সংবাদ পেয়ে গেলেন যথাসময়ে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ইয়াসিনের প্রথম কয়েক আয়াত তিলাওয়াত করে এক মুষ্টি মাটিতে ফুঁ দিলেন। দৃঢ় পায়ে দরজা পেরিয়ে কাফের ঘাতক দলের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। কুদরতিভাবে তা সকলের চোখে গিয়ে পড়ল। অন্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইল তারা। আর তাদের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিছুই টের পেল না কাফের দল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোজা চলে গেলেন প্রিয় দোস্ত হযরত আবু বকর রাযি. এর গৃহে। বেশ ক'দিন আগে থেকেই হুযূরের ইশারায় হিজরতের আভাস পেয়েছিলেন তিনি। তাই দেরি হল না। প্রিয় দোস্তকে নিয়ে রাতের আঁধারেই মক্কার অদূরে 'সওর' পর্বতে পৌঁছে গেলেন।

ভোরের স্নিগ্ধ আলো রাতের আঁধারকে দূরীভূত করে দিনের আগমনকে স্বাগত জানাতে ব্যস্ত। ঘাতকদল আরও সতর্ক হয়ে উঠল। পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজটি করতে ব্যস্ত তারা। প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল কে কার আগে হত্যা করবে মুহাম্মাদকে। ঘরে প্রবেশ করে দেখল এখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তাদের শিকার। স্বপ্ন পূরণের উত্তেজনায় ফেটে পড়ছিল তারা। কেউ কেউ এই

অবস্থাতেই ঘৃণ্য কাজটি সমাধা করতে উদ্যত হল। তবে অন্যরা বারণ করল। ঘুমন্ত অবস্থায় কাউকে হত্যা করা কাপুরুষোচিত কাজ। তা ছাড়া শত্রু যখন হাতের নাগালে, এত ব্যস্ততার প্রয়োজন নেই।

চাদর ওঠাল একজন। একি! বিস্ময়ে হতবাক সবাই। এ-যে আবু তালিবের বেটা আলী! তা হলে মুহাম্মাদ কোথায় গেল! প্রশ্ন ছিল সবার মুখে। কিন্তু উত্তর ছিল না কারো কাছে। ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল। এ মানবপ্রাচীর ভেদ করে গেল কিভাবে? এক অজানা তীরের আঘাত ক্ষত-বিক্ষত করল সবার হৃদয়-মন।

সংক্ষিপ্ত পরামর্শ, তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোঁজে দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ল ঘাতকদল। রব পড়ে গেল, মুহাম্মাদ মক্কা হতে পালিয়েছে।

পদচিহ্ন অনুসরণ করে একদল পৌঁছে গেল সওর গুহার নিকটে, যেখানে অবস্থান করছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সফরসঙ্গী আবু বকর রাযি.। শত্রুরা একটু উঁকি মারলেই দেখে ফেলত আল্লাহর হাবীবকে। কিন্তু আল্লাহর কারিশমা বান্দার বোঝার সাধ্য কোথায়? আল্লাহর রাসূল গুহা অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর মাকড়সা এসে গুহামুখে জাল বুনে দিল এবং কবুতর নতুন বাসা তৈরি করে পেড়ে রাখে ডিম। এ দৃশ্য দেখে কাফেররা ধোঁকায় পড়ে গেল। বুঝতেই পারল না তাদের বহু কাঙ্ক্ষিত শিকার এইখানেই অবস্থান করছে। ব্যর্থ মনে ফিরে গেল তারা।

মক্কাব্যাপী একই আলোচনা। একই গুঞ্জন। মুহাম্মাদ গেল কোথায়! এই দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে গেলইবা কিভাবে? চারদিকে শলা-পরামর্শ। ফিকির-ফন্দি চলতে লাগল। যেভাবেই হোক, বের করতে হবে মুহাম্মাদকে। চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে মুহাম্মাদের মিশন। তাই এবারের পদক্ষেপ হবে আরও ভয়াবহ। আরও ভয়ঙ্কর। চূড়ান্ত হামলা এবার করতে হবে। সর্বসম্মতিক্রমে এটাই হল তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

কাফেরদের এই ভয়াবহ পদক্ষেপ সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যক। যথাসময়ে শত্রুদের কর্মসূচি সম্পর্কে খবর রাখা নবীজির খুবই প্রয়োজন। কিন্তু কিভাবে? কিভাবে সংগ্রহ করবেন তাদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত। এই কঠিন মুহূর্তে এমন ভয়াবহ দায়িত্ব কে আন্জাম দিবে?

কাফেররা জানতে পারলে তার পরিণতি হবে আরও ভয়াবহ। আরও

ভয়ঙ্কর। জ্যান্ত ছাড়া হবে না তাকে। তাদের হাতে নির্ঘাত জীবন দিতে হবে। ইসলামের এই কঠিন মুহূর্তে, এ ঝুঁকিপূর্ণ গুরুদায়িত্ব মাথায় নিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নারী। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর কন্যা হযরত আসমা রাযি.। তিনি হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়ামের সহধর্মিনী এবং অসম সাহসী সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি.-এর মাতা। ইতিহাসের এই মহীয়সী নারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য জীবন উৎসর্গ করার মানসে এগিয়ে এলেন।

হযরত আসমা রাযি. ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও উপস্থিত বুদ্ধিতে সবার সেরা। হিজরতের রাত্রে রাসূল যখন আবু বকর রাযি.-এর ঘরে এলেন, তখন সবকিছুর নিখুঁত আয়োজন করে দিলেন এই মহীয়সী।

সওর-গুহায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতীক্ষার প্রহর গুনছেন। এদিকে হযরত আসমা রাযি. দিনভর কাফেরদের মাঝে ঘুরে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করে রাতের কোনো এক প্রহরে তা পৌঁছিয়ে দিতেন আল্লাহর রাসুলের নিকট। গুহা-অভ্যন্তরে রাসূলের জন্য সময়মতো খাবারের ব্যবস্থা করতেন তিনিই।

প্রতিদিন অত্যন্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে এ-মহান দায়িত্ব আন্জাম দিতেন আসমা রাযি.। কঠিন মুহূর্তে একজন নারীর জন্য এ-ধরনের পদক্ষেপ সাধারণ বিষয় নয়।

অনেক দিন হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. মদীনায় হিজরত করেছেন। বহুদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে প্রিয় রাসূলকে দেখতে পারছেন না তিনি। ভালোবাসার ঢেউ যেন উথলে পড়তে চায়। যাঁকে না দেখলে মুহূর্তও কাটে না তার, সেই প্রিয়তম রাসুলের সান্নিধ্য হতে বঞ্চিত দীর্ঘদিন ধরে। রাসুলের ভালোবাসায় টইটুম্বুর যাঁদের হৃদয়-মন, সেই প্রিয়তম রাসুলের বিরহ-যাতনা সহ্য করা কিভাবে সম্ভব? হযরত আসমা রাযি.-এর অস্থিরতা ক্রমেই বাড়ছে। কোনো কিছুতেই মন বসছে না তাঁর। এক অনাবিল সুখের পরশের আশায় ব্যাকুল তিনি। কিন্তু তা মক্কায় নেই। আছে সুদূর ইয়াসরিবে। তাই মক্কার অলি-গলি আর ভালো লাগছে না। মন বসছে না মক্কার রুক্ষ রুদ্ধ পরিবেশে। মদীনায় হিজরতের চিন্তা তাঁর মন-মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে ফেলল। কিন্তু কিভাবে পাড়ি দিবেন মদীনার সুদীর্ঘ পথ? তিনি তখন গর্ভবতী। মদীনার দুর্গম-দুস্তর পথ চলার পথে বাধার

প্রাচীর হয়ে দাঁড়ালেও প্রিয়তম রাসূলের মুহাব্বত ও ঈমানের প্রচণ্ড জোয়ারের সম্মুখে কোনো কিছু বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারল না তাঁর চলার পথে। মদীনার পথে যাত্রা করলেন তিনি। আর সেখানেই জন্ম নিল তাঁর আদরের দুলাল কলিজার টুকরা আবদুল্লাহ রাযি.। ফুটফুটে সুন্দর চেহারা। মায়াবী আকর্ষণ। যেন শিশির ভেজা গোলাপের পাঁপড়ি। সাহাবাগণ দারুণ পুলকিত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত করা হল নবজাতক ভবিষ্যতের মহানায়ক, হযরত আবদুল্লাহকে। রাসূল মুচকি হাসলেন। যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে দিলেন আবদুল্লাহর জন্য। রাসূল থুতু দিলেন আবদুল্লাহর মুখে। এই থুতুই হল শিশু আবদুল্লাহর প্রথম খাদ্য, যা তাঁর জন্য ছিল হাউজে কাউসারের মতো। তাই শাহাদাতের পরবর্তী জীবনে তিনি হয়েছিলেন ইতিহাসের অন্যতম মহানায়ক।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি.-এর শাহাদাতের দাস্তান ছিল বড় লোমহর্ষক। অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। তাঁর মা আসমা রাযি.-এর ধৈর্যের কাহিনী তাঁর চাইতে অধিক বিস্ময়কর।

ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার ইন্তেকালের পর মিশর, ইরাক, খোরাসান হিজাজসহ সিরিয়ার অধিকাংশ এলাকা তাঁর খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

কিন্তু বনু উমাইয়ার ষড়যন্ত্রকারী কূটনীতিবাজদের তা সহ্য হল না। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. এর জন্য তারা মহাসঙ্কট হয়ে দাঁড়াল। নানা কূট কৌশলে খিলাফতের সীমানা সঙ্কুচিত করে অবশেষে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নেতৃত্বে মক্কা অবরোধ করল। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র তখন বায়তুল্লাহয়। তাঁরা মুষ্টিমেয় সেনা নিয়ে হাজ্জাজের মোকাবেলায় প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। সিরীয় বাহিনী প্রবল বেগে প্রস্তর নিক্ষেপ করতে লাগল।

নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে বায়তুল্লাহর দেয়াল ফেটে পড়তে লাগল। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের প্রশান্ত মনে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগলেন। এভাবে কয়েক মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। দীর্ঘ অবরোধের কারণে মক্কায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ক্ষুৎপিপাসায় অস্থির হয়ে অনেক সেনা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের দলে যোগ দিল। এমনকি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের দুই পুত্র হামজা ও হাবীবও হাজ্জাজ-বাহিনীতে যোগ দিল। সবকিছু উপেক্ষা

করে ইবনে যুবায়ের তাঁর সামান্য কয়েকজন সঙ্গী-সাথী নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। একসময় মাথায় তীরের আঘাতে তিনি আহত হয়ে পড়লেন। দৃষ্টিসীমার ভিতরে কোথাও আলোর সামান্য ঝিলিক দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। চিন্তার পাহাড় মাথায় নিয়ে অবশেষে মায়ের কাছে ছুটে এলেন। আম্মাই পারবেন এই চরম মুহূর্তে সঠিক নির্দেশনা দিতে, যিনি জীবনে বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে হিমালয়সম অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। সুতরাং তাঁর কাছ থেকেই নিতে হবে পরামর্শ।

হযরত আসমা রাযি. এই কঠিন মুহূর্তে কলজে-ছেঁড়া ধনকে যে উপদেশ দিয়েছেন ইতিহাসে তা সত্যিই বিরল ও বিস্ময়কর। অবশ্যই তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো।

সালাম বিনিময়ের পর আসমা রাযি. বললেন,

– বাবা! এ কঠিন মুহূর্তে তুমি এখানে কেন? দেখছ না প্রস্তরাঘাতে বায়তুল্লাহর দেয়াল থরথর করে কাঁপছে? তোমার সাথীদের কোথায় ফেলে এলে?

– জানি মা। শুধু আপনার সঙ্গে কিছু পরামর্শ করতে এসেছি। দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.।

– এ মুহূর্তে পরামর্শ কিসের! আতঙ্কিত হযরত আসমা রাযি.-এর কণ্ঠ।

– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের কাতর কণ্ঠে বললেন, আম্মা! আপনি জানেন, হাজ্জাজের ভয়ে ও ধন-সম্পদের লোভে আমার বহু সঙ্গী পালিয়ে তার দলে চলে গেছে। এমনকি আমার দুই সন্তানও আমাকে ফেলে চলে গেছে। আমার মুষ্টিমেয় সাথী এখনো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর তারাও নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আম্মা অপর দিকে বনু উমাইয়ার দূতরা আমাকে অস্ত্র সমর্পণ করে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে বলছে। বিনিময়ে অনেক কিছু দিতে চায় তারা। এ-অবস্থায় আমি কী করব? ছেলের এহেন কথায় আবেগময় হয়ে পড়লেন আসমা রাযি.। ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি।

– বাবা, যদি আল্লাহর দীন জমিনে বুলন্দ করার এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত জিন্দা করার উদ্দেশ্যে লড়াই করে থাক, তাহলে তুমি হক পথে আছ। আর যদি তুমি তোমার আধিপত্য বিস্তারের মানসে এ-

যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে থাক, তাহলে এ-ধরাপৃষ্ঠে তুমিই সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী। তোমার আগেই ভাবা উচিত ছিল। এতগুলো প্রাণহানীর জন্য তুমিই দায়ী।

– আম্মা আমার সাথীগণ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে!

– তাতে কী হয়েছে! ধর্মভীরু লোকেরা কারও সহযোগিতা ছাড়াই আল্লাহর পথে লড়ে যায় অবিচল থেকে। তাছাড়া তুমি ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় থাকবেই-বা কদিন?

– আম্মা আজকেই আমি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব। তবে ভয় হচ্ছে, হাজ্জাজের লোকেরা আমার চেহারা বিকৃত করে দিবে।

– আত্মসমর্পণের চেয়ে সিংহের মতো লড়ে মরাই ভালো। আর হ্যাঁ, মৃত্যুর পর ছাগলের চামড়া খশানোর দ্বারা ছাগলের কিছু এসে যায় না।

মায়ের এসব কথা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি.-এর তপ্ত হৃদয়ে বৃষ্টির মতো কাজ করল।

স্বর্গীয় দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ল নুরানি চেহারায়। হৃদয়ে এক অনাবিল শান্তির পরশ অনুভব করলেন তিনি। আনন্দের আতিশয্যে মায়ের কপাল চুম্বন করে বললেন,

– আম্মা, অনেক অনেক মোবারকবাদ আপনাকে! আমি মোটেই ক্লান্ত হই নি। একমাত্র আল্লাহর পথে আল্লাহর দীনকে বুলন্দ করার জন্য লড়াই করছি। বাতিলের বিষদাঁত চূর্ণ করার মানসেই এই মরণযুদ্ধে জড়িয়েছি। দুনিয়ার মোহে পড়ে আমি লড়ি নি। আম্মা, আমার জন্য দুআ করবেন। আমার শাহাদাতে ব্যথিত হবেন না।

– আমি দুঃখ পেতাম যদি তুমি পলায়ন করে জীবন দিতে। বললেন মহীয়সী মা।

– আম্মা, আপনার ছেলে কোনো অপকর্মের সিদ্ধান্ত নেয় নি। কারও সঙ্গে অসদাচরণ করে নি কখনো। কখনো কুরআনের বিধান লঙ্ঘন করে নি। ইসলামের নিরাপত্তায় বিশ্বাসঘাতকতাও করে নি। আম্মা, আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমি সত্য পথে আছি।

হযরত আসমা রাযি.-এর মুখমণ্ডল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আবেগাপ্লুত হয়ে ছেলের মাথায় হাত রাখলেন এবং সারা দেহে হাত বুলিয়ে দিলেন। হঠাৎ চমকে উঠলেন তিনি। যেন বিষাক্ত কিছুর উপর হাত পড়েছে। বললেন,

– একি! তুমি এটা কি পরেছ?

– বর্ম, মা!

– আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত কামনাকারীর জন্য এটা শোভন নয়।

– শুধু সান্ত্বনার জন্য এটা পরিধান করেছি আম্মা!

– না, তার প্রয়োজন নেই। ওটা খুলে ফেল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বর্ম খুলে ফেললেন। আর বললেন,

– আম্মা, আপনি আমার জন্য একটু দুআ করুন...

অশ্রুসজল চোখে তাকালেন মা শহীদী ঈদগাহের ইমামের দিকে। তারপর আকাশের দিকে দুই হাত উচিয়ে ধরলেন। হে আল্লাহ! তোমার দীনকে বুলন্দ করার জন্য আবদুল্লাহ তোমার রাহে শহীদ হতে যাচ্ছে। তুমি তার শাহাদাত কবুল কর। হে আল্লাহ! আমি তাকে তোমার হাতে অর্পণ করলাম। আর তোমার ফয়সালায় আমি সন্তুষ্ট। আমাকে ধৈর্যশীলদের কাতারে শামিল করে নাও।

মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. ছুটে চললেন রণাঙ্গনে। শত্রু-বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। বীরবিক্রমে জিহাদ করে শত্রু-বাহিনীর বেষ্টনির ভিতর চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে রণাঙ্গন আবার কেঁপে উঠল। কিন্তু তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। কারণ শত্রুদের নিকট তিনি ও তার সাথীরা ছিলেন মহাসমুদ্রের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নৌকার মতো। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে তা বেশিক্ষণ টিকতে পারল না। শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.।

ইতিহাসের সোনালি অধ্যায় আজও তাঁর বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধগাঁথা বর্ণনা করে গর্ববোধ করে। যুগের বীর সেনানীদের আলোকময় দিক-নির্দেশনা দান করে।

শাহাদাতের পর হাজ্জাজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর মস্তক কর্তন করে আবদুল মালেকের নিকট পাঠিয়ে দেয়। আর তাঁর মস্তকবিহীন দেহ মক্কার বাইরে এক উঁচু স্থানে ঝুলিয়ে রাখে।

একজন মা সন্তানের এই মর্মান্তিক দৃশ্য কিভাবে সহ্য করেছেন কলমের ভাষায় তা ব্যক্ত করা আদৌ সম্ভব নয়। তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে খবর পাঠালেন, আবদুল্লাহর দেহ শূলি থেকে নামিয়ে কোনো এক জায়গায় সমাহিত করার জন্য। কিন্তু পাষণ্ড হাজ্জাজ এই মহীয়সী মায়ের সামান্য আবদারটুকু রাখল না।

মক্কার লোকেরা আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. এর লাশের পাশ দিয়ে গমন করতেন আর সেদিকে তাকিয়ে নীরবে অশ্রু ঝরাতেন।

ঘটনাক্রমে হযরত আসমা রাযি. একবার তাঁর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় অপলক নেত্রে ছেলের লাশের দিকে চেয়ে রইলেন। চোখের অশ্রুতে বুক ভাসিয়ে দিলেন। কলজে-পোড়া এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চলে গেলেন। এর কয়েকদিন পরই তিনি এই নশ্বর পৃথিবীকে আলবিদা জানিয়ে চলে গেলেন পরপারে। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল এক শ বছর। দীর্ঘ এই বর্ণাঢ্য জীবনে রেখে গেছেন অনেক ত্যাগ। হাজারো প্রতিকূলতার মাঝে যেখানে বীর পুরুষেরাও দাঁড়াতে অক্ষম ছিল, সেইখানে এই মহীয়সী নারী দাঁড়িয়েছিলেন দৃঢ়পদে, শির উঁচু করে। ইতিহাসের পাতায় এর নজির পাওয়া দুষ্কর।

বীর নারী উম্মে উমারা রাযি.

ইসলামের দ্বিতীয় যুদ্ধ। অহুদের যুদ্ধ। সাইয়েদুল মুজাহিদীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত শ সেনাসদস্য নিয়ে অহুদ প্রান্তরে উপস্থিত হলেন। তাঁদের হাতে ছিল হাতেগোনা কয়েকটা তলোয়ার এবং নামমাত্র কিছু রসদসামগ্রী। তবে ঈমানি বলে বলীয়ান ছিল তাঁদের প্রত্যেকের হৃদয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসায় তাঁদের অন্তর ছিল ঠাসা। কোনো ভয় নেই। কোনো শঙ্কা নেই। সবাই অটল। অবিচল। আল্লাহর রাসূল তো সঙ্গেই আছেন। তবে ভয় কিসের!

অপর দিকে কাফের বাহিনী ছিল তাদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি এবং সবাই ছিল তখনকার অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। অহঙ্কার, দাম্ভিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসছে তারা। তাদের মধ্যেও কোনো আশঙ্কা নেই। কারণ প্রতিপক্ষ অস্ত্রের দিক দিয়ে বাহ্যত খুবই দুর্বল।

উভয়পক্ষ মুখোমুখি হল। সাহাবীগণ তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল। শুরু হল এক প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধ। হক ও বাতিলের যুদ্ধ। ইসলামকে চিরতরে মিটিয়ে দিতে চাইছে যারা, তারা মুসলমানদের সম্মুখে বেশিক্ষণ টিকতে পারল না। খড়-কুটার ন্যায় ভেসে যেতে লাগল কাফেরগোষ্ঠী। মুহূর্তের মধ্যে কাফেরদের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল তাদের মাঝে। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হতভম্ব হয়ে পিছু হটতে লাগল।

কিন্তু মুসলমানদের সামান্য একটু ভুলের কারণে অনেক বড় মাশুল দিতে হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়ের চূড়ায় পঞ্চাশজনের এক ক্ষুদ্র বাহিনী মোতায়েন রেখেছিলেন। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, যুদ্ধে জয় হোক বা পরাজয়, এখানে অবিচল থাকবে। কারণ যে কোনো মুহূর্তে পিছন থেকে আক্রমণ আসতে পারে।

কিন্তু সামান্য সময়ের ব্যবধানে রাসূলের নির্দেশ ভুলে গেলেন তাঁরা। নিশ্চিত বিজয় জেনে সেখান থেকে তাঁরা চলে এলেন গনিমতের মাল কুঁড়ানোর জন্য। তাঁরা ভাবতেও পারেন নি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে একটু অবহেলা ঘুরিয়ে দিতে পারে যুদ্ধের মোড়।

মুসলিম বাহিনীর দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। সেই দিকে কাফের বাহিনীর পক্ষে সেনাপতি ছিলেন খালেদ। তিনি তখনও ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন নি।

বিচক্ষণ খালেদ বিন ওলিদের চোখে এই দুর্বল দিকটি এঁড়িয়ে যায় নি। সেদিক দিয়েই হামলা করে বসলেন তিনি। মুসলমানরা কিছু বুঝে উঠতে পারল না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল মুসলিম বাহিনী। মার খেতে আরম্ভ করল তারা। ধরাশয়ী হতে লাগল একের পর এক। মৃতদের গোঙানি আর আহতের আর্তচিৎকারে অহুদ প্রান্তর ভারি হয়ে উঠল।

কিন্তু কাফের-গোষ্ঠীর প্রকৃত আক্রোশ ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তাই তারা সুযোগ বুঝে একযোগে হামলা করল আল্লাহর হাবীবের উপর। বহু মুসলিম সেনা রাসূলকে বাঁচাতে এগিয়ে এসে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। রাসুলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করলেন। আহত হলেন অনেকে।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে, এই নাজুক মুহূর্তে যেসব মুসলমান জানবাজি রেখে লড়াই করে যাচ্ছিলেন, রাসূলকে রক্ষা করতে তাঁরা মুখোমুখি হলেন মৃত্যুর। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রাসুলের প্রিয় সাহাবী ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ মহীয়সী উম্মে উমারা রাযি.।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যে কজন বীরাঙ্গনা রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন তাদের অন্যতম তিনি। তিনি যখন মুসলমানদের বিপর্যয় দেখতে পেলেন। দেখতে পেলেন একের পর এক মুসলিম সেনা শহীদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কাঁখের মশক পাত্র ফেলে দিয়ে রাসূলকে রক্ষা করার জন্য ছুটে এলেন তিনি। দেখলেন কাফের বাহিনী

এই সেই উম্মে উমারা রাযি. যিনি সামান্য বিচলিত হন নি। হন নি কোনো রকম শঙ্কিত। পাহাড়ের ন্যায় অটল-অবিচল থেকে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করলেন।

আল্লাহর রাসূল ও দীনে ইসলাম রক্ষার্থে উম্মে উমারার ভূমিকা পুরুষদের বীরত্বকেও হার মানায়।

এমন নাজুক মুহূর্তে তিনি এত কিছু করে দেখালেন! একজন নারী এর চেয়ে বেশি আর কী করতে পারে! বরং একজন পুরুষই কি এমন পরিস্থিতিতে উম্মে উমারার চেয়ে বেশি করতে পারে।

দুর্ধর্ষ কাফের-যোদ্ধা ইবনে কামিয়া, যে মুসআব ইবনে উমায়েরের মতো বীর সাহাবীকে শহীদ করে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। উম্মে উমারা রাযি. তাঁর অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিলেন। তিনি অত্যন্ত বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছেন। আঘাত পেয়েছেন। পাল্টা আঘাত করেছেন। তার প্রচণ্ড আঘাত থেকে ইবনে কামিয়া বাঁচতে পারে নি। লৌহবর্ম থাকায় কাফেরটা সেবারের মতো বেঁচে যায়।

হযরত উম্মে উমারা রাযি.-এর কাঁধের আক্রমণের ক্ষতটি এতই গভীর ছিল যে, হাত ঢুকে যেত!

ইসলামের জন্য নারীদের কত ত্যাগ। কত কুরবানি। বীরাঙ্গনা উম্মে উমারার বীরত্বপূর্ণ কীর্তির জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দুআ করেছেন। তাঁর প্রশংসা করেছেন। প্রিয় নবীর প্রশংসাবাণী দ্বারা ধন্য হয়েছেন তিনি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে উমারার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেমকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তোমাদের পরিবারে বরকত নাযিল করুন। তোমার মায়ের অবস্থান অমুক অমুক সাহাবীর চেয়েও ঊর্ধ্বে।'

উম্মে উমারা শুনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দুআ করুন যেন জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকতে পারি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! এদেরকে জান্নাতে আমার সাথী বানিয়ে দাও।'

রাসূলের মুখ নিঃসৃত এই দুআ শুনে হযরত উম্মে উমারা রাযি. দারুণ খুশি হলেন। খুশির বন্যা বয়ে গেল হৃদয়ে। আনন্দে দুচোখ অশ্রুসজল হয়ে পড়ল। সকল দুঃখ-কষ্ট ভুলে গেলেন তিনি। সেইদিন থেকে জিহাদের প্রতি উম্মে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে ফেলেছে। আর সামান্য কজন মুসলিম সৈন্য রাসূলের চারপাশে রক্ষণাত্মক আক্রমণ করছে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। সারাদেহে বিদ্যুৎ খেলে গেল তাঁর। রক্তের নেশায় জ্বলজ্বল করে উঠল চক্ষুজোড়া। যেন ক্ষুধার্ত বাঘিনী। অস্ত্র নিয়ে বীরদর্পে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাফেরদের মাঝে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষ্য করলেন উম্মে উমারার হাতে ঢাল নেই। তাই একজন মুসলিম সৈন্যের ঢাল নিয়ে তাকে অর্পণ করলেন। তাঁর মাধ্যমে তিনি রাসুলের প্রতি নিক্ষিপ্ত তীর প্রতিহত করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন হিংস্র ইবনে কুমিয়া সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে। দেখতে দৈত্যের মতো, মনে তার কুটিলতা। জিঘাংসার আগুন তার চেহারায় পরিস্ফুট।

ইবনে কামিয়া এসে হাঁক ছাড়ল, মুহাম্মাদ কোথায়? তাকে দেখিয়ে দাও। আমি তাকে হত্যা করব। আজ আমার কাছ থেকে তার নিস্তার নেই। যে করেই হোক আমি তাকে হত্যা করব। অন্যথায় মুহাম্মাদের হাতে আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

উম্মে উমারা ও মুসআব ইবনে উমায়ের তাকে প্রতিহত করতে লাগলেন। একসময় মুসআব বিন উমায়েরকে সে শহীদ করে দিল। এখন ইবনে কামিয়া ও উম্মে উমারা লড়ছেন। প্রাণপণ লড়াই। কেউ কাউকে ছাড়বার নয়।

এক প্রচণ্ড আঘাত উম্মে উমারার হাতে লাগল। তবু তিনি লড়ে যাচ্ছেন। একসময় সেই কাফের নিরুপায় হয়ে পলায়ন করল।

উম্মে উমারার এক ছেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থেকে লড়ে যাচ্ছেন। রাসুলের প্রতি নিক্ষিপ্ত তীর তরবারির আঘাত প্রতিহত করছেন। হঠাৎ এক কাফের এসে তাঁর উপর আক্রমণ করল। এতে তাঁর হাত বাহু থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হল। ইতোমধ্যে হযরত উম্মে উমারা রাযি. কাফেরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ধরাশায়ী হয়ে পড়ল। তরবারির উপর্যুপরি আঘাতে তার দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। একপর্যায়ে সে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে উমারার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। বললেন, 'উম্মে উমারা! তুমি যা করতে পার, অন্য কেউ তা পারে না। তুমি তার থেকে তোমার ছেলের যথেষ্ট বদলা নিয়েছ। সমস্ত প্রশংসা সেই মহান প্রভুর, যিনি তোমাকে প্রতিশোধ নেওয়ার তৌফিক দান করেছেন।'

উমারার হৃদয়ে গভীর ভালোবাসা জন্ম নেয়। জিহাদের কোনো সুযোগ এলে নিজেকে ধরে রাখতে পারতেন না তিনি।

মহীয়সী জননী উম্মে ইবরাহিম

ইরাকের বসরা নগরী। প্রাচীন নগরী। স্বপ্নের শহর। সে যুগে বসরা ছিল জ্ঞানে-গুণে সমৃদ্ধ। মুজাহিদদের অজেয় ক্যাম্প। এই নগরীতে জিহাদি চেতনায় উজ্জীবিত কয়েকজন মুজাহিদ নারী ছিলেন, যাঁদের ত্যাগের কথা পৃথিবী ভুলতে পারবে না কোনোকালে। উম্মে ইবরাহিম ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তার ঈমানি চেতনা, জিহাদি উদ্দীপনা আজও মুমিনদের অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ত্যাগের পথকে উন্মুক্ত সুপ্রশস্ত করে। শাহাদাতের পথকে করে সুগম। বিজয়কে করে তরান্বিত।

ইসলামের শত্রুরা সীমান্ত এলাকায় তুমুল আক্রমণ করছিল তখন। তাই সাধারণ মুসলিম জনতাকে জিহাদি চেতনায় উজ্জীবিত করা ছিল খুবই প্রয়োজন। শুরু হল বিভিন্ন সভা, ওয়াজ-মাহফিল, বয়ান-বক্তৃতা।

প্রখ্যাত মুজাহিদ নেতা শায়খ আবদুল ওয়াহিদ ইবনে জায়েদ বসরি রহ. ছিলেন বসরার অন্যতম আলিমে দীন। জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনিও একটি সভায় বক্তৃতা করছিলেন।

জিহাদি বক্তৃতা। আগুন-ঝরা বয়ান। আমজনতা, আলিম এবং সবশ্রেণীর মানুষে ভরপুর মজলিস। শায়খ তার বক্তৃতায় জান্নাতের নেয়ামতরাজির কথা আলোচনা করলেন। সঙ্গে হুরদের আলোচনাও করলেন। হুরদের সৌন্দর্য ও লাবণ্য সম্পর্কে একটি আবেগময় কবিতা আবৃত্তি করলেন, যা শুনে মানুষের মধ্যে এক অন্যরকম উন্মাদনা সৃষ্টি হল। জিহাদি চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে গেল সবাই। আবেগ উচ্ছ্বাসের এক তুফান বয়ে গেল পুরো মজলিসে।

উম্মে ইবরাহিমও উপস্থিত ছিল উক্ত মজলিসে। তার শিরা-উপশিরায় খুন টগবগ করতে লাগল। আবেগে, উচ্ছ্বাসে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, হে আবু উবাইদ! আপনি জানেন যে, এ-শহরের এমন কোনো পরিবার নেই যেই পরিবার থেকে আমার ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিবাহ দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু আমি কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করি নি। আপনি এখন যে হুরের সৌন্দর্য, লাবণ্য সম্পর্কে বয়ান করলেন, সত্যিই তা আমাকে অবাক করেছে। তার উৎকর্ষ হৃদয়ে এক

অপার্থিব আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। আমি আমার ছেলেকে সেই হুরের সঙ্গে বিবাহ দিতে চাই। আপনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করুন। আর কবিতাটি আবার আবৃত্তি করুন।

শায়খ আবদুল ওয়াহিদ তাঁর কবিতাটি আবার আবৃত্তি করলেন, যার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এই–

আলোর জন্ম হয় তাঁর চেহারার আলো থেকেই।
খোশবুর উৎপত্তি খাঁটি আতর থেকেই।
এই হুর যদি নিজের জুতো দিয়ে বালুকারাশিকেও পদাঘাত করে,
তবে বৃষ্টি ছাড়াই সারাপ্রান্তর প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।
যদি তার মুখের মধুময় থুতু সাগরে নিক্ষেপ করা হয়,
তবে সমুদ্রের পানি স্থলভাগের প্রাণীর জন্য মিষ্টি-মধুর হয়ে যাবে।
কারও দৃষ্টি যখন তার গণ্ডদেশে পতিত হয় তাহলে সম্ভাবনা আছে-
তাঁর জল্পনা-কল্পনা হুরের গণ্ডদেশকে জখম করে দিবে।

কবিতাগুলো শুনে উপস্থিত লোকেরা আত্মহারা হয়ে গেল। উম্মে ইবরাহিম সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বললেন, হে আবু উবাইদ! মেয়েটির রূপ-সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আপনি আমার ছেলের সঙ্গে তাঁকে বিবাহ পড়িয়ে দিন। দেনমোহর হিসেবে দশ হাজার দিনার এবং আমার ছেলেকে দিলাম।

তারপর আমার একমাত্র কলিজার টুকরা ইবরাহিম আপনার সঙ্গে জিহাদে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমার ছেলেকে শহীদের উচ্চ মর্যাদা দান করবেন এবং কিয়ামতের ময়দানে সে আমার জন্য এবং তাঁর পিতার জন্য সুপারিশ করবে।

শায়খ আবু উবাইদ বললেন, আপনি যদি সত্যিই এমনটি করতে চান তা হলে অবশ্যই আপনি, আপনার ছেলে এবং তাঁর পিতা সফলকাম হবেন।

এরপর উম্মে ইবরাহিম উল্লাসিত হয়ে বললেন, হে প্রিয় বৎস! তুমি কি এসব গুণে গুণান্বিত মেয়েকে বিবাহ করতে প্রস্তুত? তা হলে এর দেনমোহরস্বরূপ তুমি নিজেকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ কর। আর ভবিষ্যতে কোনো গুনাহ করবে না।

যুবক ইবরাহিম বলল, আমি প্রস্তুত আম্মাজান। ছেলের কথা শুনে ইবরাহিমের আম্মা দু-হাত উঁচু করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বললেন, হে

আমার মাওলা! তুমি সাক্ষী থেক। আমি আমার ছেলেকে এই হুরের সঙ্গে বিবাহ দিলাম। এই শর্তে যে, জিহাদ করে সে তাঁর প্রাণ তোমার রাহে কোরবান করবে। আর জীবনে কখনও গুনাহ করবে না। হে প্রভু, তুমি কবুল কর।

তারপর উম্মে ইবরাহিম ঘরে চলে গেলেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে দশ হাজার দিনার নিয়ে উপস্থিত হলেন। শায়খের হাতে দিনারগুলো দিয়ে বললেন, এই নিন আমার পুত্র-বধূর দেনমোহর। এগুলো জিহাদের কাজে আসবে।

তারপর তিনি তাঁর পুত্রের জন্য একটি তেজি ঘোড়া ক্রয় করলেন। এবং *যুদ্ধের সকল সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দিয়ে বললেন, বেটা! যাও। আল্লাহর দীন* বুলন্দ করার জন্য আল্লাহর রাহে তোমার জীবন উৎসর্গ করে দাও। আর শোনো, তোমার আমার দেখা এই দুনিয়ায় নয় আখেরাতে হবে, যখন তুমি শুহাদার কাতারে থাকবে।

বর্ণনাকারী বলেন, উম্মে ইবরাহিম তাঁর ছেলেকে কর্পুর মিশ্রিত সুগন্ধিযুক্ত কাফনের কাপড় সঙ্গে দিয়ে দিলেন। তারপর শায়খ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে বসরা নগরী ত্যাগ করে দূরে এক রণাঙ্গনে উপস্থিত হলেন।

শায়খ আবদুল ওয়াহিদ বলেন, যখন আমরা শত্রুদের এলাকায় পৌঁছলাম। সবাই খোলা প্রান্তরে নেমে এল এবং ব্যাপক হামলা হল। ইবরাহিম ছিল তখন সম্মুখ-সারিতে। ভয়ঙ্কর লড়াই লড়ল সে। প্রাণপণ লড়াই করল। শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করে তছনছ করে দিল। নির্বিকার চিত্তে লড়াই করতে লাগল। দারুণ ছন্দে আছে সে।

একসময় শত্রুদের বিশাল বাহিনী তাদের বেষ্টনিতে আবদ্ধ করে ফেলল ইবরাহিমকে। এভাবে শহীদের অমৃত সুধা পান করল সে। কিছুক্ষণ পর এই যুদ্ধে আমরাই বিজয়ী হলাম।

এরপর আমরা বসরায় পৌছে সাথীদের বললাম, উম্মে ইবরাহিমকে আমি সংবাদ দেওয়ার পূর্বে তোমরা কেউ কিছু তাকে বল না। তাঁকে আমিই সান্ত্বনা দেব যাতে এমন না হয় যে, সে অধৈর্য হয়ে পড়ে আর তাঁর সওয়াব বিনষ্ট হয়ে যায়।

আমরা যখন বিজয়ীর বেশে বসরায় ফিরে এলাম তখন শহরের লোকজন আমাদের স্বাগত জানাতে প্রচণ্ড ভিড় করল। এর মধ্যে উম্মে ইবরাহিমও ছিল।

উপচে পড়া ভিড় ঠেলে সে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বলল, হে আবু উবাইদ! বলুন, আল্লাহ কি আমার হাদিয়া গ্রহণ করেছেন? যদি গ্রহণ না করেন তাহলে আনন্দের আয়োজনে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

শায়খ বললেন, হে উম্মে ইবরাহিম! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ তাআলা আপনার হাদিয়া গ্রহণ করেছেন। ইবরাহিম এখন শহীদদের সঙ্গে উৎফুল্লচিত্তে পানাহারে মশগুল আছে।

উম্মে ইবরাহিম আনন্দ ধরে রাখতে পারলেন না। আত্মহারা হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন।

কিশোরী নাহিদ আমাদের প্রেরণার উৎস

'কোনো কালে একা হয় নি কোনো জয়ী পুরুষের তরবারী
শক্তি দিয়েছে প্রেরণা দিয়েছে বিজয়ী লক্ষ্মী নারী।'

কবি কাজী নজরুল ইসলামের এই পঙ্‌ক্তি চিরন্তন সত্য। যুগ-যুগান্তরের প্রতিটি বীরত্বপূর্ণ অভিযানেই কোনো না কোনোভাবে তারা ভূমিকা রেখেছে। সকল যুদ্ধেই নারীরা ছিল পুরুষের প্রেরণার উৎস।

এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ইসলামের প্রথম যুগে আরবের মা-বোনদের দিকে তাকালে। স্বামীকে নিজের মতো করে সাজিয়ে জিহাদে পাঠাতেন, সন্তানকে তলোয়ার ও খুনের মাঝে দাঁড় করিয়ে দেওয়া জীবনের বড় এবং চূড়ান্ত স্বপ্ন ছিল। জিহাদের ময়দান থেকে পিঠ দেখিয়ে চলে এলে তিরস্কার করত সে যুগের নারীরা। পৃথিবীর সকল মায়া-মমতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধের তাদের ঈমানি জজবার সামনে কোনোই মূল্য ছিল না। নিজের চোখের সামনে আপন সন্তান শহীদ হয়ে যাচ্ছে, ধড় হতে মস্তক পৃথক হয়ে জমিনে গড়াগড়ি খাচ্ছে, তাতেও তাদের আঁখিযুগল সিক্ত হয় নি বেদনার লোনা জলে। স্বামী আল্লাহর পথে কোরবান হয়ে যাবে যাক, তাতেও তারা এতটুকু দুঃখ অনুভব করেন নি।

পাহাড়ের মতো অটল অবিচল ছিল তাদের ঈমান। পৃথিবীর কোনো পরাশক্তি তাদের ঈমানের সামনে এসে টিকতে পারে নি। এমনি এক কিশোরী নারী- নাহিদ, সম্প্রতি আফগানিস্তানে বর্বর রুশ বাহিনীর হাতে তাকে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করতে হয়। আফগানিস্তানে কমিউনিস্টরা ক্ষমতা

দখলের পূর্বেই সর্দার দাউদ নারীমুক্তির নামে আফগান ধর্মপ্রাণ নারীদেরকে মর্যাদাপূর্ণ সামাজিক অবস্থান থেকে বিচ্যুত করে বেহায়াপনা আর বেলেল্লাপনার শেষ সীমায় নিয়ে এসেছিল। সর্দার দাউদের উত্তরসূরি আমানুল্লাহর আমলেও নারী স্বাধীনতার সস্তা শ্লোগান তুলে ইসলামের পর্দা-বিধানকে অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করার হীনপ্রয়াস চালানো হয়েছিল। কিন্তু প্রতিটি ঘৃণ্য অপচেষ্টাই আফগান জনসাধারণের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও দুর্জয় ইসলামী চেতনার সামনে পরাজিত হয়েছে। সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন হয়ে গেছে শক্তিশালী ধর্মীয় প্রতিরক্ষা ব্যূহের সামনে। এরপর যখন কমিউনিস্টরা আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করে নিল, তখন ফ্রি-সেক্সের নামে সে দেশের তরুণ-তরুণীদের বিপথগামী করার উদ্যোগ নেয় তারা। কমিউনিস্ট পার্টির লোকজন তাদের মহিলা আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে ক্লাবে যোগ দিতে শুরু করে। রাস্তা-ঘাটে, শপিং সেন্টারে, হোটেল-রেস্তোরাঁয় নারীদের অবাধ ও অসঙ্গত চলাফেরা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশীয় কমিউনিস্ট এজেন্টরা তাদের আত্মীয় মহিলাদের ঘরের বাইরে বের করে এ-কথাই বোঝাতে চেয়েছে যে, আফগানিস্তানে এখন অবগুণ্ঠিত মহিলাদের দিন ফুরিয়ে গেছে। অবরোধবাসিনী নারীসমাজ এবার মুক্তবিহঙ্গের মতো ডানা মেলে উড়তে শুরু করেছে কমিনিউজমের বিস্তীর্ণ ভুবনে। অল্পদিনের মধ্যেই নারীস্বাধীনতার চরম রূপ আফগানিস্তানের প্রগতিবাদী নাস্তিকরা দেখতে পেল। তাদের মা-বোন, কুলবধূ-কন্যা রত্নরা রুশ দখলদারবাহিনী ও অধিকৃত আফগানিস্তানে সমাগত সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের হাতে হাত রেখে শুধু নৃত্য করছে তাই না, বরং উন্নতির এ-পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এখন রুশীয় মুরব্বিদের বিছানায়ও তাদের যেতে হচ্ছে নিয়মিত। তখন আফগান কমিউনিস্ট পরিবারেও এমন কিছু আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, সচেতন মহিলা ছিলেন, যারা অন্যায় ও পাপাচারের এ উত্তাল সমুদ্রেও নিজেদের ঈমান ও ইজ্জত নিয়ে কঠিন পর্বতের ন্যায় দৃঢ় হয়ে টিকে থেকেছেন। এমনি এক বোনের নাম নাহিদ। তাঁর পিতা একজন পাক্কা কমিউনিস্ট।

তাঁর পাষণ্ড পিতা সোভিয়েত প্রভুদের হৃদয়-মন জয় করার উদ্দেশ্যে তাঁকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু নাহিদ ওদের লাম্পট্যের আসরে আত্মাহুতি না দিয়ে পরিণত হয়েছে মুসলিম নারীজাতির জন্য পথপ্রদর্শক সুউচ্চ আলোর মিনারে। নাহিদ রাজধানী কাবুলের ঐতিহ্যবাহী রাবেয়া বসরি বালিকা

বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির অসম্ভব মেধাবী ছাত্রী। তার বাবা ফরিদ খান ছিলেন কাবুলের কমিউনিস্ট পার্টির একজন দালাল। ছোট বেলায় নাহিদের মা মারা যায়। একটু ধর্মভীরু ও নম্র প্রকৃতির মেধাবী ছাত্রী হিসেবে তাঁর নামও ছিল সকলের মুখে। আল্লাহ তাআলা তাকে রূপ-সৌন্দর্যও দান করেছিলেন অন্য দশজনের চেয়ে বেশি। পরিবেশ ও শিক্ষার গুণে ছোটবেলা থেকেই নাহিদের মনে দেশপ্রেম ও ধর্মচেতনা শিকড় গেড়ে বসে। মুক্ত স্বাধীন মুসলিম আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর আগ্রাসন ও খোদাদ্রোহী কমিউনিস্টদের শাসনক্ষমতা দখলে নাহিদের কোমল হৃদয় মারাত্মকভাবে আহত হয়। কিন্তু অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতার সঙ্গে তাঁর মনোভাব চেপে রাখে। মনের সঠিক অবস্থা বুঝতে দেয় নি বাড়ির কাউকে, বিচক্ষণ মেয়ে নাহিদ। একজন কমিউনিস্ট নেতার কন্যা হওয়ার সুবাদে বাড়িতে বসেই অনেক আগাম সংবাদ ও পরিকল্পনা জানার সুযোগ পেত সে।

অতএব আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ও ইজ্জতের লড়াইয়ে নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে নাহিদ। এভাবে অনেক গোপন তথ্য আগাম জানিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আযাদির লড়াইয়ে সে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। পাশাপাশি তাঁর স্কুলের সহপাঠিনীদের মাঝেও গোপনে জিহাদের উত্তাপ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। নাহিদের মতো সচেতন ছাত্রীদের অব্যাহত প্রচেষ্টার সুফল হিসেবে গোটা আফগান-জিহাদে মুসলিম-নারীসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্ভব হয়। কাবুলের রাবেয়া বসরি গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা সেদিন আফগান মুজাহিদদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গগন বিদারী স্লোগান তুলে কাবুলের রাজপথে নেমেছিল।

এ-বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাই একদা রুশবাহিনী ও কারমাল সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের লক্ষ্যে কালো ওড়না উড়িয়ে রাজপথে বেরিয়েছিল। রুশবাহিনী এদের বিক্ষোভ মিছিলে গুলি চালিয়েছিল নির্বিচারে। গুলিতে বহু ছাত্রী হতাহত হয়। সে মিছিলের পুরোভাগে একটি আফগান কিশোরী পতাকা বহন করছিল। সেনাবাহিনীর গুলিতে তার দুটি হাতই অচল হয়ে যাওয়ায় সে তাঁর সহপাঠিনীর হাতে পতাকাটি তুলে দিয়ে বলেছিল, এটা শক্ত করে ধর বোন। এ তো ইসলামের পতাকা, এদেশের আযাদির পবিত্র ঝাণ্ডা এটা। একে কিছুতেই নিচে নামতে দিয়ো না।

আযাদির জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত এসব ছাত্রী নাহিদের স্কুলেরই বান্ধবী।

নাহিদের বাড়িতে প্রায়ই ওরা বেড়াতে আসত। তাঁর পিতা ছিল একজন উচ্চ পদস্থ কমিউনিস্ট কর্মকর্তা। তাই বড় বড় অফিসাররা অনেক সময় নাহিদদের বাড়িতে আসত। একদিন জনৈক রুশ কর্মকর্তা নাহিদকে দেখে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত সেনা কর্মকর্তার মনে একটা কুমতলবের উদয় হয়। নাহিদের বাবা ফরিদ খানকে বলে, তোমার মেয়ের নাচ দেখতে হবে ফরিদ খান। সেনা অফিসারটি মনে মনে ভাবতে থাকে, এতো খুবসুরত, সুন্দরী, রূপসী কন্যা ঘরে রেখে ফরিদ খান আমাদের সঙ্গে বেইমানী করছে। আরো আগেই তো মেয়েকে ক্লাবে নিয়ে যাওয়া দরকার ছিল। মুক্ত চিন্তা ও উদার মনের অধিকারী, প্রগতিশীল কমিউনিস্ট নেতা ফরিদ খানের পক্ষে এ-প্রস্তাব গ্রহণ করা ছিল নিতান্ত সহজ। এ-ছাড়া রুশবাহিনীর সামনে 'না' উচ্চারণ করার অধিকার খোদ কাবুল সরকার প্রধানেরও নেই। কিন্তু ফরিদ খান ভালো করেই জানেন যে, তার মেয়ে নাহিদকে কোনো ক্রমেই ক্লাবে নিয়ে নাচানো যাবে না। তাই ফরিদ খান খুব নরম সুরে বলতে শুরু করলেন, নাহিদ খুব লাজুক স্বভাবের মেয়ে। ক্লাবে গিয়ে সে নাচতে রাজি হবে না। রুশ কর্মকর্তা ধমকের সুরে বললেন, তুমি না কমিউনিস্ট? ফরিদ খান দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল, জি, অবশ্যই আমি কমিউনিস্ট।

এবার রুশ কর্মকর্তা অত্যন্ত রাগত সুরে চিবিয়ে চিবেয়ে বলল, না, তুমি এখনো কমিউনিস্ট হতে পার নি! কোনো কমিউনিস্টই এমন সেকেলে হতে পারে না। কোনো কমিউনিস্টের স্ত্রী-কন্যাই বিদ্রোহী মৌলবাদীদের মতো প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে না। আমাদের মেয়েরা তো স্বাচ্ছন্দ্যে নেচে-গেয়ে ক্লাবগুলোকে মাতিয়ে রাখে। যদি আসলেই তোমরা দেশের সত্যিকার উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি চাও, তবে খালেস কমিউনিস্ট হয়ে যাও। নিজেদের স্ত্রীদের তথাকথিত লজ্জা-শরমের শিকল মুক্ত করে স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ নিতে দাও। এ-মহান (!) উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরা এতো দূর থেকে এসেছি তোমাদের কল্যাণে।

রুশ কর্মকর্তার এসব কথা শুনে ফরিদ খান খুব লজ্জিত হল। ফরিদ খান ভাবছে, এরা কত কষ্ট করে দেশ, মাতৃভূমি ছেড়ে শুধু আমাদের স্বার্থে, আমাদের উন্নতি অগ্রগতির জন্য এত কষ্ট সহ্য করছে। আর আমরা এই সামান্য ত্যাগ দিতে পারি না? লজ্জায় তার মাথা নুয়ে এল।

রুশ সেনা অফিসারটি ফরিদ খানকে প্রগতিশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে,

নাহিদকে ক্লাবে নিয়ে যাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে চলে গেল।

নিজেকে পাক্কা কমিউনিস্ট প্রমাণ করার আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি রুশ প্রভুদের অসন্তুষ্টির ভয়ও ফরিদ খানের মনে ক্রিয়া করছে। মেয়েকে বোঝানোর চেষ্টা করল। নাহিদ যদি ক্লাবে গিয়ে সেনাকর্মকর্তাদের সঙ্গে একটু নাচতে সম্মত হয়, তাহলে তাঁর বাবার পদমর্যাদা বাড়বে। বৃদ্ধি পাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তার সম্পর্ক। এসব কথা শুনে নাহিদ ভিতরে ভিতরে অগ্নিদগ্ধ হতে থাকে। সে অত্যন্ত শান্ত অথচ কঠোর উচ্চারণে বাবাকে বলে, আপনাকে আমি খুব ভালোবাসি আর শ্রদ্ধা করি বলেই একজন খোদাদ্রোহী নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও আপনার সঙ্গে এখনো আমি বসবাস করছি। আমি ভাবতেও পারি না যে, কোনো জন্মদাতা পিতা এতটা আত্মমর্যাদাহীন হতে পারে। আপনি তো শুধু ইসলামকেই ত্যাগ করেন নি; বরং আমাদের দেশীয় এবং সমাজিক নিয়ম-নীতিগুলো পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছেন।

ফরিদ খান তার একমাত্র কিশোরী কন্যাকে স্নেহমাখা কণ্ঠে বুঝাতে থাকেন, শোন মা, তুমি বেশি সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছ। একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ, ইসলাম একটা মধ্যযুগীয় আদর্শ। সেই আদিকালের কিছু নীতিকথা। এক শ্রেণির ধর্মব্যবসায়ী সরলমনা জনসাধারণকে শোষণ করার উদ্দেশ্য এসব বিধি-নিষেধের জাল পাতছে।

দেড় হাজার বছর আগে ইসলাম হয়ত আধুনিক একটা জীবনাদর্শ হিসেবে সফল হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে বর্তমান উন্নতি ও প্রগতির যুগে সেটিই আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে কেন? কি করে সম্ভব হাজার বছর আগের একটা আদর্শ এ সময়েও মেনে চলা? নাহিদ, তুমি কি কখনো চিন্তা করে দেখেছ, লজ্জা-শরম ও শালীনতার দোহাই দিয়ে আফগান নারীসমাজের উপর কি পরিমাণ নির্যাতন চলছে? এসব মোল্লা-মৌলবি যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট, সেই আমেরিকার অবস্থাই চিন্তা কর। ওখানে তো নারীরা স্বাধীন। ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কল-কারখানায় কাজ করছে। সভা-সমিতি, মিটিং-মিছিল করছে। ক্লাবে অবাধে যাতায়াত করছে। এসব মৌলবাদীরাই শুধু ইসলামের নামে এ-দেশীয় নারীসমাজকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। যদি তুমি নিজেকে সময়ের সঙ্গে পরিচালিত না কর, তাহলে অনেক পিছনে পড়ে যাবে। আমি চাই, তুমি সামাজিক হও। তুমি যতটুকু সুন্দরী সে পরিমাণ সামাজিকতা যদি তোমার মধ্যে সৃষ্টি হয়, তাহলে শুধু

তোমার বাবার মর্যাদাই বাড়বে না, তোমার জীবনেরও একটা হিল্লে হয়ে যাবে। মনের মতো সঙ্গী পাবে তুমি। বড় বড় সোভিয়েত কর্মকর্তাও ঘুর-ঘুর করবে তোমাকে বিবাহ করার জন্য।

নাহিদের বাবা যে এত বেশি প্রগতিশীল হয়ে গেছে, আত্মমর্যাদাবোধ বা সামাজিক মূল্যবোধ বলতে আর কিছুই যে তার মধ্যে অবশিষ্ট নেই, এ বিষয়টি এত স্পষ্টভাবে কোনোদিন ধরা পড়ে নি নাহিদের কাছে। নিজের কোমল হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পেয়েও স্বাভাবিক থেকে সে বলল, আপনি যে জীবনাদর্শকে মধ্যযুগীয় ও প্রাচীন বলছেন, সেই জীবনাদর্শই নারীসমাজকে ওই মর্যাদা দিয়েছে যা- আমেরিকা ও রাশিয়া দিতে পারে নি। ইসলামে মা-বোন-কন্যার যেই সম্মান রয়েছে দুনিয়ার অন্য কোনো আদর্শে বা ধর্মে কি সে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে? স্ত্রীকে ইসলাম যে অধিকার দিয়েছে তার কি কোনো তুলনা হয়? আপনার বক্তব্য শুনে তো আপনাকে বাবা বলতেও আমার লজ্জা হচ্ছে। আপনি নিজের দীন ও ঈমান বিক্রি করেছেন। নিজের মাতৃভূমির স্বাধীনতা ওই সোভিয়েত লাল কুকুরদের হাতে বিক্রি করে দিয়েছেন। এখন নিজ কন্যার মান-ইজ্জতও নিলামে উঠানোর চেষ্টায় আছেন। আপনি কি চান যে, আপনার কন্যা ওই নাস্তিক কাফেরদের সামনে নৃত্য করুক। তাদের হাতে হাত রেখে মাখামাখি করুক? আপনি এখন একজন ঈমান বিক্রেতা। দেশের পবিত্র স্বাধীনতা ও নিজ কন্যাসন্তানের সম্ভ্রমের সওদাগর।

মেয়ের বক্তব্য শুনে মি. ফরিদ খান ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রাগে ফেটে পড়বেন যেন। মেয়েকে বললেন, তোমার ধর্ম কি তোমাকে এ-শিক্ষা দিয়েছে যে, পিতার সঙ্গে এমন বেয়াদবিমূলক কথা বলবে, যে পিতা শুধু তোমার উন্নতি ও সুখের কথাই ভেবে থাকে?

নাহিদের স্পষ্ট জবাব, হ্যাঁ, আমার ধর্ম আমাকে এ-শিক্ষাই দেয় যে, নিজের জন্মদাতা পিতাও যদি ইসলামবিদ্বেষী ও খোদাবিমুখ হয়ে যায়, তবে তার পিতৃত্বের বন্ধনও ছিন্ন হয়ে যায়।

নাচতে যাওয়ার জন্য ফরিদ খান তার মেয়েকে অনেকভাবে রাজি করাতে চেষ্টা করল। প্রথমে আদর সোহাগ দিয়ে, অবশেষে ধমকের সুরে। শেষ পর্যন্ত জোর করেই একদিন ফরিদ খান নাহিদকে ক্লাবে নিয়ে গিয়ে রুশ সেনা অফিসারদের হাতে তুলে দিয়ে সে বাইরে চলে আসে।

রুশ কর্মকর্তারা নাহিদকে নাচতে অনুরোধ করে ব্যর্থ হয়। নাহিদ কিছুতেই

নাচবে না। সে সুস্পষ্ট জানিয়ে দেয়, আমি মুসলমান, আল্লাহর রাস্তায় আমার এ-নগণ্য প্রাণটা দিয়ে দিতে পারি তবু আমি তোমাদের সঙ্গে নাচব না।

জনৈক অফিসার বলল, ইসলাম তো অনেক আগেই আফগানিস্তান হতে বিদায় নিয়েছে।

–আর এ-ক্লাবের জলসাঘরে তোমার আল্লাহও আসবে না। নরম কথায় তুমি যদি রাজি না হও তবে অন্য পদ্ধতি আমাদের জানা আছে।

–তোমরা হয়ত ভুলে যাচ্ছ, আমি এক পাহাড়ি মেয়ে। সব ধরনের নিপীড়ন সহ্য করার মতো ধৈর্য ও মনোবল আমার রয়েছে।

–তোমার হয়ত জানা নেই, আমাদের হাতে এমন শক্তিশালী অস্ত্র রয়েছে, যা পর্বতকেও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে সক্ষম।

–আমার আল্লাহ তোমাদের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী। তাঁর এক দুর্বল বাঁদীকে কষ্ট দিতে যদি তোমাদের এতই ইচ্ছে হয়, তবে ইনশাআল্লাহ আমাকে একটা মজবুত পাহাড়ের চেয়েও শক্ত ও সুদৃঢ় পাবে।

অফিসার নিরাশ হয়ে অবশেষে নির্যাতনের পথই বেছে নিল। নাহিদের গায়ের কাপড়চোপড় ছিড়ে ফেলল তারা। এরপর জলন্ত সিগারেটের ছেঁকা দিতে লাগল তাঁর শরীরে। ছুরির খোঁচায় তাঁর শরীরে নিজের অপবিত্র নাম লিখতে লাগল সে পাষণ্ড অফিসার। সবকিছু চরম ধৈর্যের সঙ্গে মুখ বুজে সয়ে গেল নাহিদ। নাহিদ এমন এক পর্বত হয়ে গেল, যার সঙ্গে পাহাড় টক্কর দিলেও গুঁড়ো হয়ে যাবে।

এভাবে রাতভর তাদের পৈশাচিক নির্যাতন চলল কিশোরী নাহিদের উপর। রাতের শেষ দিকে নাহিদ এ-নশ্বর পৃথিবীকে আলবিদা জানিয়ে চিরতরে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু তার চেহারায় একফালি বিজয়ের হাসি লেগেই ছিল। নাহিদ শহীদ হয়ে গেল। কিন্তু সেনারা তাকে নাচাতে পারে নি। মৃত্যুর সময় নাহিদ শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে দুটো স্লোগান তুলে ছিল, আল্লাহু আকবার ও আফগানিস্তান জিন্দাবাদ। এটাই ছিল নাহিদের শেষ কথা। শহীদ হওয়ার পর রুশীয়রা নাহিদের অনাবৃত দেহ একটি মসজিদের চত্বরে ফেলে রাখে। ফজরের সময় মুসল্লিরা লাশটি দেখলে গোটা এলাকায় শোক ও দুঃখের ছায়া নেমে আসে। পরদিন যখন স্কুলের ছাত্রীরা নাহিদের শাহাদাতের সংবাদ পায়। সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের নেত্রী, তাদের বান্ধবীর লাশ নিয়ে যাওয়ার জন্য মসজিদ চত্বরে এসে সমবেত হয়। নাহিদের লাশ ছুয়ে তারা জিহাদের শপথ

নেয় এবং তাঁর রক্ত দিয়ে মসজিদের প্রাচীরে একজন ছাত্রী লিখে দেয় আযাদি। মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে বিশ্বমুসলিমের অলস নিঁদ ভাঙাবার জন্য এমন নাহিদরা কি আবারও আত্মপ্রকাশ করবে না?

একজন মহিলা মুজাহিদের ভাষণ

এমন একজন মহিলার বক্তব্য উল্লেখ করব, যাঁর সাহস, বুদ্ধিমত্তা শুধু প্রশংসাযোগ্যই নয়, অনুসরণযোগ্যও। শুধু নারীদের জন্যই নয়, পুরুষদের জন্যও রয়েছে এতে সুস্পষ্ট পথনির্দেশ। তৎকালীন তাতারি সরকারের শিকার এই মহিলা ছিলেন একজন জানবাজ মুজাহিদকন্যা। তাঁর সম্পর্কে তৎকালীন জনৈক মুজাহিদ নেতা হাতি বিন ইউসুফ বলেছিলেন, সূরাইয়া! ইসলামী বিশ্ব যতদিন পর্যন্ত তোমাদের মতো মেয়ে জন্মাতে থাকবে, ততদিন কোনো শক্তিই মুসলমানদেরকে ধ্বংস করতে পারবে না। প্রতিযুগে তোমাদের মতো একজন করে সূরাইয়ার প্রয়োজন।

এই নির্ভীক মুজাহিদ মহিলা প্রথমে নারীদের তারপর পুরুষদের উদ্দেশে যে ঈমানদীপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন, তা এখানে উল্লেখ করা হল।

নারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন-

'মুসলমান সন্তানদের মধ্যে আগেকার সে শৌর্য-বীর্য এখন অবশিষ্ট নেই। তাই তোমরা এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে হতাশ হয়ে পড়েছ। তোমাদের মধ্যে সোনালি যুগের মুজাহিদদের মতো শাহাদাত বরণের সে উৎসাহ-উদ্দীপনা আর নেই। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করছি, সেই বীর নারীরা আজ কোথায়, যারা একদিন ভাইকে, স্বামীকে যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছু হটতে দেখে তাঁবুর খুঁটি তুলে নিয়ে বলত, যদি তুমি কাপুরুষের পরিচয় দাও, তাহলে তোমার মস্তক এই লাঠির আঘাতে ভেঙে দেব।

'আমার বোনেরা! মনে রেখ, পতনমুখী জাতির শেষ অবলম্বন কওমের নারীরা। যতক্ষণ তোমাদের বুক ঈমানের নুরে দীপ্তিমান থাকবে, ততক্ষণ তোমাদের পুত্রদের, স্বামীদের, ভাইদের দুনিয়ার কোনো শক্তি পরাজিত করতে পারবে না। যতক্ষণ কওমের ঈমানদার মায়েদের পবিত্র দুধ রক্ত হয়ে তাদের সন্তানদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হতে থাকবে, ততক্ষণ তাদের মধ্যে শাহাদাতের গৌরব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা জীবন্ত হয়ে থাকবে। আর যতক্ষণ ইসলামের বীর সন্তানদের মধ্যে জীবন্ত থাকবে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা, ততক্ষণ

তারা যে কোনো বড় শত্রুর জন্য বয়ে আনবে মৃত্যুর পয়গাম।

'কওম যদি প্রাণহীন মুর্দাই হয়ে থাকে, তাহলে পুনরুজ্জীবিত করার মতো আবে হায়াত রয়েছে তোমাদের হাতে। কওম ঘুমন্ত থাকলে তোমরাই তাকে ঝাকুনি দিয়ে ঘুম ভাঙাবে। তোমরা পুরুষদের পথের শিকল হয়ো না। স্বামীদের বল, তারা যুদ্ধের ময়দান হতে মাথা উঁচু করে ফিরে আসুক। তোমরা ঘরের মধ্যে তাদের ইজ্জত-আবরু হেফাজত করবে।'

'ভাইদের বল, তারা ময়দানে বুক পেতে দিয়ে তীরের আঘাত গ্রহণ করুক। তোমরা তাদের নিয়ে গর্ব করবে। পুত্রদের বলে দাও, ময়দানে যদি তারা কাপুরুষের পরিচয় দেয় আর পিছন থেকে আঘাত খেয়ে ফিরে আসে তাহলে রোজ কিয়ামতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে তোমরা আরজি পেশ করবে, যেন তিনি তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ না করেন। কারণ তারা তোমাদের দুধের মর্যাদা রক্ষা করে নি।'

পুরুষদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,

'তাঁতারিদেরকে যারা ভয় করে তাদেরকে আমি ভাই মানতে রাজি নই। তাদেরকে বলে দিন, মুসলমান মায়ের দুধ পান করে বড় হয়েছে, এমন কোনো বালিকাও এ ধরনের কাপুরুষকে ভাই বলে স্বীকার করবে না। যদি তারা কর্তব্যপালনে অবহেলা করে, তাহলে আমরা হাতের কাঁকন খুলে তাদের পরিয়ে দেব এবং তাদের হাতের জংধরা তলোয়ার নিয়ে তাঁতারিদের সামনে দাঁড়াব। আমাদের ভালোবাসা ও আনুগত্য বাহাদুর সিপাহিদের জন্য, ভীরুদের জন্য নয়। তারা যদি আমাদের ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দাদের কাতারে দাঁড়াবার আশা যেন না করে। সেদিন ইসলামের বীর নারীরা যদি কাউকে ভাই বলে স্বীকার করে, তাহলে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি হবেন মুহাম্মাদ বিন কাসিমের মতো মুজাহিদ, যিনি তাঁর কওমের একজন নারীর ইজ্জত রক্ষার জন্য মাত্র সতের বছর বয়সে একটি বিশাল রাজ্য জয় করেছিলেন। সেদিন মুসলিম নারী নিজের কাপুরুষ স্বামীকে ভুলে শাহাদাতের খুনে রঙিন পোশাক পরিহিত অপর কোনো বোনের স্বামীকে নিয়ে গর্ব করবেন। মুসলমান মায়েরা সেদিন বলবেন, আমাদের সন্তান সেই কাপুরুষ মানুষ নয়, যারা দুশমনদের তলোয়ারের আঘাতে বুক পেতে দিতে পারে নি। আমাদের সন্তান সেইসব বীর মুজাহিদ, যাদের শৌর্য-সাহস মুসলিম নারীকে করেছে দুনিয়ার নারীসমাজের চোখে

সম্মানিত। তারা যদি চান যে, আমরা তাদেরকে ভাই বলি, তাহলে সামনে আসতে হবে খুনরাঙা পোশাক পরে; দেহে যখমের দাগ নিয়ে।'

একদিন এই মুজাহিদ মহিলা শহরের উচ্চবিত্ত খানদানের মহিলাদের তাঁর বাড়িতে দাওয়াত দিলেন। তাদের সামনে তিনি তাতারি জুলুমের মর্মন্তুদ কাহিনী বর্ণনা করে তাদের আবেদন জানালেন, তারা যেন পুরুষদের গাফলতির ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। অন্যথায়, নৃশংসতা ও বর্বরতার তুফান আশপাশের ইসলামী রাজ্যগুলোকে বরবাদ করে হিন্দুস্তানের দরজায় আঘাত হানবে। সম্মিলিত বিপদের মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রতিরোধের। সূরাইয়া তাদেরকে বুঝালেন, কওমের নারীরা কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিলে পুরুষদের মধ্যে কেউই গাদ্দারি করার সাহস করবে না। স্ত্রী স্বামীকে, বোন ভাইকে, আর মা তার সন্তানকে কওমের জন্য লড়াই করতে বাধ্য করতে পারে। পুরুষদের ঐক্য ও ত্যাগই কওমের স্ত্রী-কন্যাদের হেফাজতের জামিন হতে পারে। সূরাইয়া হিন্দুস্তানের অবস্থা বিশ্লেষণ করে তাদেরকে বোঝালেন যে, সুলতান ও ওমারাদের অনৈক্যের অবসান না হলে তাতারিদের প্ররোচনায় দেশের কোটি কোটি অমুসলিম মুসলমানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।

সূরাইয়ার মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে মহিলারা পুরুষদের বুঝিয়ে পথে আনার শপথ গ্রহণ করলেন। এ-সূচনা ছিল খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক। এরপর প্রত্যেক সন্ধ্যায় কোনো না কোনো মহল্লায় মহিলাদের জলসা বসতে লাগল। আর বীরাঙ্গনা সূরাইয়া তাতে বক্তৃতা দিতে লাগলেন।

আজ যখন দুনিয়ার তাবৎ কুফরি শক্তি সন্ত্রাস নির্মূলের অজুহাতে 'ক্রুসেড' ঘোষণা করে মুসলমানদের নির্মূল করছে জঘন্য কৌশলে, তখন কি সূরাইয়ার মতো আমাদের মা-বোনেরা কর্মদীপ্ত হয়ে পুরুষদের গাফলতির ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবে না? মুসলিমদের মাঝে আজ সূরাইয়ার মতো বীর নারীদের বড় প্রয়োজন।

নির্যাতিতা ফাতিমার আর্তনাদ

ইরাকের রাজধানী বাগদাদের কুখ্যাত আবুগারিব কারাগার। যেখানে হাজার হাজার মুসলিম নর-নারীর উপর চলেছে বহু অমানুষিক নির্যাতন।

অবর্ণনীয় নির্যাতনে অগুনতি মা-বোন হারিয়ে যাচ্ছে এই দুনিয়া থেকে।

এই আবুগারিব কারাগারেই অতর্কিত হামলা চালায় ইরাকি মুক্তিযোদ্ধারা। ইরাকি যোদ্ধাদের এই হামলা ছিল অপ্রত্যাশিত। দুঃসাহসিক এই হামলা চালানো হয়েছে ইরাকি কিশোরী ফাতিমার চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে।

জানবাজ একজন ইরাকি যোদ্ধার বোন ফাতিমা। ওই ইরাকি যোদ্ধাকে আটক করার লক্ষ্যে তার বাড়ি ঘেরাও করে মেরিনসেনা। তাকে না পেয়ে তার বোন ফাতিমাকে ধরে নিয়ে যায় পাষণ্ড হায়েনারা। এরপর মার্কিন সেনারা তার উপর চালায় পাশবিক নির্যাতন। নির্যাতিত ফাতিমা বহুকষ্টে একটি চিঠি পাঠাতে সক্ষম হয় ইরাকি যোদ্ধাদের কাছে। এর উপর ভিত্তি করেই তারা অভাবনীয় দুঃসাহসিক হামলা চালায় আবুগারিব কারাগারে। ফাতিমাসহ অন্য ইরাকি বন্দিদের উদ্ধার করাই ছিল হামলার একমাত্র উদ্দেশ্য। কী লেখা ছিল ফাতিমার সেই চিঠিতে? এই প্রশ্ন সবার। ফাতিমার সেই চিঠির বাংলা অনুবাদ দেওয়া হল-

'মহান করুণাময় আল্লাহ তাআলার নামে শুরু করছি।

'বল, আল্লাহ এক, তিনি সবকিছুর একমাত্র স্বত্বাধিকারী। তিনি কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি এবং কাউকে তিনি জন্ম দেন নি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই, কিছুই নেই এবং ভবিষ্যতেও তাঁর সমতুল্য কেউ হবে না।

'প্রিয় ইরাকি মুক্তিকামী ভাইয়েরা, আমি শুরুতে সূরা ইখলাসের উদ্ধৃতি দিলাম। কারণ, এই সূরাটি আমার কাছে মহান আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরতে সবচেয়ে ভালো বলে মনে হয়েছে। মুমিনদের অন্তরে এই সূরাটি গেঁথে আছে খুব দৃঢ়ভাবে।

হে আল্লাহর পথে লড়াইকারী প্রিয় ভাইয়েরা! আপনাদেরকে বলার আর কী আছে আমার? শুধু এতটুকু বলি, আমার মতো অসংখ্য ইরাকি বোনকে আটকে রাখা হয়েছে। মার্কিন নরপিশাচেরা তাদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালাচ্ছে। আমাদের পেটে এখন মার্কিন পশুদের বাচ্চা।

'প্রিয় ভাইয়েরা! আমি আপনাদের ধর্মসম্পর্কের বোন। আমাকে একদিনে ৯বার শ্লীলতাহানির শিকার হতে হয়েছে। ধারণা করতে পারেন! আচ্ছা আপনার সহোদর বোনের যদি এভাবে শ্লীলতাহানী করা হত, কেমন লাগত আপনার? আমার মতো ১৩টি মেয়ে রয়েছে কারাগারের এই প্রকোষ্ঠে। সকলেই অবিবাহিতা। মার্কিন সেনারা আমাদের শরীর থেকে পোশাক কেড়ে

নিয়ে গেছে। সকলের সামনেই তারা আমাদের শ্লীলতাহানী করে। এই হচ্ছে আমাদের এখানকার দিনলিপি! আমাদের এখানকার একটি মেয়ে নির্যাতন সইতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। এক মার্কিন সেনা তার শ্লীলতাহানির পর তার বুক ও উড়ুতে প্রচণ্ড আঘাত করে। তার উপর এমন অত্যাচার করা হয় যা কল্পনাও করতে পারবেন না। এরপর মেয়েটি দেয়ালের সঙ্গে মাথা ঠুকে ঠুকে আত্মহত্যা করে। আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। মহান আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন আশা রাখি। কারণ তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আমরা ইরাকি মেয়েরা যা কখনও কল্পনাও করতে পারি নি সেরকম ভয়াবহ নিষ্ঠুর নিপীড়ন, অপমান আর লাঞ্ছনার শিকারে পরিণত হয়েছি।

এরচেয়ে মর্মান্তিক এই দুনিয়ায় আর কিছুই হতে পারে না। আর এই যন্ত্রণা কেউ কখন ভাষায়ও প্রকাশ করতে পারে না। কারাগারে প্রতিরাতেই নির্মম নির্যাতন চালানো হয়। মার্কিন পশুগুলোর নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে আমরা লাঞ্ছিত হচ্ছি প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত। পশুগুলো এসেই আমাদের শরীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়ে যায় আমাদের। পশুগুলোর অত্যাচার থেকে একটি রাতও মুক্তি পাই না আমরা। আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি। আপনারা আবুগারিব কারাগারে হামলা করুন। আমাদেরসহ তাদের ধ্বংস করে দিন। আমাদেরকে এখানে ফেলে রাখবেন না। অনুগ্রহ করে আমাদেরসহ তাদেরকে ধুলোয় মিশিয়ে দিন। ট্যাংক আর জঙ্গি বিমানকে পরোয়া না করে ছুটে আসুন নরকখানায়। আমাদের প্রতি এতটুকু মায়া রাখবেন না প্লিজ। আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদেরসহ তাদের মেরে ফেলুন। আমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে যেই সতীত্ব রক্ষা করে চলি চিরদিন, সেই সতীত্ব এই পশুদের হাতে খুইয়ে ফেলেছি। এখন আর বেঁচে থাকার কোনো স্বার্থকতা নেই। আমরা পবিত্র কুরআনকে গলায় ঝুলিয়ে রাখি। সেই কুরআন তারা ছিঁড়ে ফেলে। আমাদের চারপাশে তারা পবিত্র কুরআনের পাতা ছিঁড়ে ফেলে রাখছে।

প্রিয় ভাইয়েরা! আমি আবারও অনুরোধ করছি, তাদের হত্যা করুন। ধ্বংস করে দিন। আর আপনাদের হামলার ফলে যদি আমরাও ধ্বংস হয়ে যাই, তাতেও শান্তি পাব। আমরা মৃত্যুর মাধ্যমেই মুক্তি পেতে চাই এই জাহান্নামের বিভীষিকা থেকে। অনুগ্রহপূর্বক আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন।'

ফাতিমার চিঠিটি পাওয়ার পর প্রায় একশ ইরাকি মুজাহিদ আবুগারিব কারাগারে হামলা চালায়। তারা মার্কিন সেনাদের কারাগারের কম্পাউন্ডকে পিছু হটে যেতে বাধ্য করে। ইরাকি যোদ্ধারা ৮২ এম এম এবং ১২০ এম এম মর্টার সেল নিক্ষেপ করে মার্কিন সেনাদের লক্ষ্য করে। অবশেষে কারাগারের একটি দেওয়াল ধ্বসিয়ে দিতে সক্ষম হয় মুজাহিদরা। মাখফারাত আল ইসলামের বাগদাদ প্রতিনিধির এক প্রতিবেদনে এ-খবর জানা যায়। তবে এই পত্র লেখিকা ফাতিমা ও তার সঙ্গে থাকা হতভাগ্য অন্যান্য ইরাকি কিশোরীর ভাগ্যে কী ঘটেছিল তা জানা যায় নি। ইসলামপন্থী যোদ্ধাদের একটি ওয়েব সাইডে লেখা হয়েছে, দুঃখিত বোন! আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষ নই। সত্যিই যদি মানুষ হতাম, তাহলে তোমার চিঠির জবাবে আমরা আবুগারিব কারাগার ধুলোয় মিশিয়ে দিতাম।

শহীদ স্বামীর পাশে একজন বীর নারী

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাযি. এর খেলাফতকাল। চারদিকে ইসলামের জয়জয়কার। মুসলমানদের ভয়ে থরথর করে কাঁপছে বিশ্বের সমস্ত তাগুতি শক্তি। বিভিন্ন ভূখণ্ড পেরিয়ে মুজাহিদরা পৌঁছে গেছে রোম পারস্যের সীমানা ছাড়িয়ে। একের পর এক লড়াইয়ে তাগুতি শক্তিগুলোকে দুপায়ে দলে সামনে অগ্রসর হচ্ছে মুসলিমবাহিনী। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণপণ লড়ছে তারা। এ-অসীম যুদ্ধে শুধু যে পুরুষদের ভূমিকা ছিল তা নয়, বিভিন্ন সময় নারীরাও প্রাণপণ লড়েছে শত্রুর বিরুদ্ধে। শক্তি, সাহস, বুদ্ধি দিয়ে পুরুষদের ডান হাত হয়ে ময়দানে কাজ করেছে তারা। এমনি এক নারী হযরত আবান বিন সাঈদের বীরাঙ্গনা স্ত্রীর বীরত্বগাথা এখানে আলোচনা করছি।

মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার হযরত আবু উবায়দা রাযি.। তিনি তাঁর সাথীদের যুদ্ধের নির্দেশ দেন। অপরদিকে কাফের বাহিনীর কমান্ডার (প্রকৃত নাম নয়) টমা গেটের কাছে এল। সে ছিল বড় সাধু প্রকৃতির লোক। রোমানদের মধ্যে টমার চেয়ে বড় কোনো আবেদ-জাহেদ ছিল না। এ-কারণে রোমানরা তাকে অত্যন্ত সম্মান করত। তার কথায় জান উৎসর্গ করতে পারাকে তারা নিজেদের সৌভাগ্য মনে করত।

টমা তার প্রাসাদ থেকে বের হয়। মাথায় শোভা পাচ্ছে একটি ক্রুশ। সে

একটি উঁচু স্থানে দাঁড়ালো। তার চারপাশে বড় বড় সেনা কর্মকর্তাও দাঁড়িয়ে। কিছু লোক ইঞ্জিল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। টমা ইঞ্জিলের পাতায় হাত রেখে বলল,

'হে আল্লাহ! আমরা যদি সত্যের উপর থাকি, তাহলে আমাদেরকে সাহায্য করুন। শত্রুদের হাতে আমাদেরকে তুলে দেবেন না। আমাদের মধ্যে যে অন্যায়কারী তাকে আপনি সাহায্য করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি তার ব্যাপারে অবগত। হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে ক্রুশ এবং যে তার ধর্মে অটল তার অসিলায় আপনার নৈকট্য কামনা করছি। আপনি আমাদেরকে অলৌকিক ও ঐশী নিদর্শন দেখান। আমাদেরকে এ-জালিমদের উপর সাহায্য করুন।'

সেনাসদস্যরা টমার এসব কথা শুনে পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী ও আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে। হযরত কায়েস রাযি., কাতেবে অহী শুরাহবিল বিন হাসানার নেতৃত্বে টমা গেটে যুদ্ধ করেন। তিনি বলেন, টমাসহ রোমানদের কথাবার্তা ভাষান্তর করে দিতেন বসরার ইসলাম গ্রহণকারী শাসক বুমাস। হযরত শুরাহবিল বিন হাসানার নিকট টমার এসব কথাবার্তা কেমন যেন লাগল, তাই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন,

'ওহে অভিশপ্ত, তুমি মিথ্যা বলছ, আল্লাহর নিকট ঈসার তুলনা আদমের ন্যায়, তাঁকে তিনি মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে তিনি যতদিন ইচ্ছা জীবিত রাখলেন এবং যখন ইচ্ছা আকাশে তুলে নিলেন।'

তারপর বুমাস টমার দিকে তীর নিক্ষেপ করেন। তখন টমা তীব্র যুদ্ধ শুরু করে দেয়। সে পাথর ছুড়ে মুসলিম সেনাদেরকে বিক্ষিপ্ত করে দিল এবং তীরের আঘাতে কিছু মুসলমানকে আহত করতে সক্ষম হল। আহতদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত আবান বিন সাইদ ইবনুল আস রাযি.। বিষাক্ত তীরের আঘাতে তিনি ছটফট করছিলেন। সাথীরা তাঁকে ধরাধরি করে ক্যাম্পে নিয়ে আসে। তারা তাঁর পাগড়িটি খুলে ফেলতে চাইল। তিনি বললেন, আমার পাগড়ি খুলবেন না। পাগড়ি খুললে আমার প্রাণ বের হয়ে যাবে। আমি যা চেয়েছি মহান আল্লাহ তাআলা আমাকে তা দান করেছেন। কিন্তু সাথীরা তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে তাঁর পাগড়ি খুলে ফেলল। পাগড়ি খালার পর তিনি আকাশের দিকে ইশারা করে বললেন,

أَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُه هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنَ وَ

صَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ

অর্থ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং রাসূল। এটা সে বস্তু, যার ওয়াদা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। রাসূলগণ সত্য বলেছেন।

এ-কথা বলতেই তাঁর রুহ নশ্বর এ-পৃথিবী ছেড়ে প্রভুর নিকট চলে যায়। হযরত আবান রাযি.-এর স্ত্রী ছিলেন তাঁর চাচাতো বোন। কিছুদিন পূর্বে তাঁদের বিবাহ হয়েছিল। বিবাহের সময় তাঁর হাতে লাগানো মেহেদি ও মাথায় লাগানো আতরের সুগন্ধি এখনো বের হচ্ছে। তিনি সাহসী ও বীর পরিবারের কন্যা ছিলেন। যখন তিনি স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ শুনলেন, তখনই স্বামীর লাশের পাশে চলে এলেন। তিনি হা-হুতাশ করেন নি, বরং ধৈর্যধারণ করেছেন। এ সময় তার জবান থেকে শুধু এ-কথাটিই বের হয়েছে-

আমাকে যা দান করা হয়েছে, তা নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট এবং আপনি আপনার প্রভুর নিকট চলে গেলেন, যিনি আমাদের দুজনের মাঝে মিলন ঘটিয়েছিলেন। তারপর তিনি আমাদের দুজনার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটালেন। আমি আপনার সঙ্গে গিয়ে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ করে যাব। আমি আপনার প্রতি অনুরাগী আপনার পর কারও পক্ষে আমাকে স্পর্শ করা জায়েজ হবে না। আমি নিজেকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করেছি। হতে পারে আপনার সঙ্গে শিগ্‌গিরই মিলিত হব।'

হযরত খালেদ বিন ওলিদ রাযি. হযরত আবান বিন সাঈদের জানাজা পড়ালেন। তাঁকে দাফন করে তাঁর স্ত্রী কালবিলম্ব না করে স্বামীর অস্ত্র হাতে তুলে নিলেন এবং হযরত খালেদ বিন ওলিদ রাযি.-কে না-জানিয়েই যুদ্ধরত মুজাহিদদের সঙ্গে মিশে গেলেন। প্রথমে তিনি জানতে চান, তাঁর স্বামী কোন্ গেটে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁরা বললেন, টমা গেটে। তাঁকে শহীদ করে সম্রাটের মেয়ে-জামাই টমা। তখন তিনি টমা গেটে হযরত শুরাহবিল বিন হাসানার নেতৃত্বাধীন মুজাহিদদের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন এবং তাঁদের সঙ্গে মিলেমিশে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ করলেন। হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা রাযি. বলেন, দামেস্ক অবরোধ করার সময় টমা গেটের উপর ক্রুশ হাতে একজন লোক দেখেছিলাম। সে ছিল টমার গাইড। সে বলেছিল,

'হে আল্লাহ! এ ক্রুশ এবং যে এর আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাকে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য ক্রুশের ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে দিন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।'

আমি তাঁর দিকে বার-বার তাকাচ্ছিলাম। হঠাৎ আবানের স্ত্রী তার দিকে একটি তীর নিক্ষেপ করলেন। তীর তার হাতে লাগল। ফলে তার হাত থেকে মুক্তাখচিত ক্রুশটি পড়ে গিয়ে আমাদের দিকে গড়াগড়ি দিয়ে চলে আসে। তখন আমাদের কিছু সাথী ক্রুশটি তুলে নেওয়ার জন্য দৌড়ে যায়। ক্রুশটি কে কার আগে তুলে নেবে সে ব্যাপারে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়।

আল্লাহর দুশমন টমা তাদের ক্রুশ নিয়ে মুসলমানদের এ টানা-হেঁচড়া দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হল। বলল, সম্রাটের কাছে এ-খবর পৌছে যাবে যে, আরবরা আমাদের কাছ থেকে ক্রুশ ছিনিয়ে নিয়েছে। এটা কখনও হতে পারে না। এ-বলে সে তরবারি হাতে মুসলমানদের দিকে এগিয়ে আসতে চাইল এবং বলল, তোমাদের যার মন চায় আমার সঙ্গে এস। আর যার মন চায় থাক। যেভাবেই হোক এদের সঙ্গে আমার মোকাবেলা করতেই হবে। গেট খোলার নির্দেশ দিয়ে সে বাইরে চলে আসে, তার পিছনে পিছনে রোমান সেনারাও পঙ্গপালের ন্যায় ধেয়ে এল।

এদিকে মুসলমানরা ক্রুশটিকে ঘিরে রেখেছিল। রোমানদের বের হতে দেখে মুসলিম সৈন্যরা ক্রুশটি হযরত শুরাহবিল রাযি.-এর নিকট হস্তান্তর করে। রোমানরা এসে মুসলমানদের উপর তীর ও পাথর বর্ষণ শুরু করে। তাদের কিছু লোক দেয়ালের উপর থেকে, ছাদের উপর দাঁড়িয়ে তীর ও পাথর বর্ষণ করতে থাকে। তখন হযরত শুরাহবিল রাযি. ডাক দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর পথের মুজাহিদগণ! আপনারা গেটের উপর দাঁড়ানো আল্লাহর শত্রুদের তীর থেকে নিরাপদ থাকার জন্য একটু পিছনে চলে যান। লোকজন নির্দেশ পালন করল। টমা তাদের দিকে এগিয়ে যায়। সে ডানে বামে যাকে পাচ্ছে তীর ছুঁড়ছে। তার সঙ্গে রয়েছে কিছু বীর সেনা। হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা এ-অবস্থা দেখে চিৎকার করে বললেন,

'হে লোক সকল! আপনারা জান্নাতের সন্ধানে মৃত্যুর কথা ভুলে যান এবং নিজেদের কর্ম দ্বারা সৃষ্টিকর্তাকে সন্তুষ্ট করুন। তিনি আপনাদের পলায়ন ও পিছুটান পছন্দ করেন না। অতএব আপনারা কাছে গিয়ে তাদের উপর হামলা করুন। আল্লাহ আপনাদের কাজে বরকত দিন।'

হযরত শুরাহবিলের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা শুনে মুসলিম সৈন্যরা তীর-তরবারি নিয়ে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এদিকে দামেস্কের লোকজন জানতে পারল যে, টমা তার গেট দিয়ে বেরিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছে এবং তার ক্রুশটি মুসলমানরা নিয়ে গেছে। তখন তারা তার দিকে দৌড়ে এল। টমা ক্রুশের সন্ধানে এদিক সেদিক তাকাচ্ছিল। হঠাৎ তার দৃষ্টি হযরত শুরাহবিল বিন হাসানার প্রতি পড়ল। তাঁর হাতে ক্রুশ দেখে সে আর ধৈর্যধারণ করতে পারল না। চিৎকার দিয়ে বলল, ক্রুশ দিয়ে দাও। তোমার মায়ের মৃত্যু হোক।

হযরত শুরাহবিল রাযি. আল্লাহর দুশমন টমাকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। ক্রুশ হাত থেকে ফেলে তার দিকে ছুটে যান। আবানের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, লোকটা কে? বলা হল, সে সম্রাটের মেয়ে-জামাই এবং আপনার স্বামীর ঘাতক টমা, তখন তিনি ক্রুশ তুলে নেন। হযরত আবান রাযি.-এর স্ত্রী লোকদের বললেন, তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করুন। তীরটা টমার ডান চোখে বিদ্ধ হয়। সে হযরত শুরাহবিলের কাছ থেকে সরে যায়। কিন্তু হযরত আবানের স্ত্রী তার দিকে দৌড়ে যান। তিনি টমার দিকে আরও তীর ছুড়তে চাইলেন। কিন্তু টমার সাথীরা তাকে ঢাল দিয়ে রক্ষা করে। এ সময় কিছু মুসলিম সৈন্য হযরত আবানের স্ত্রীর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। হযরত আবানের স্ত্রী তীর ছুঁড়েই চলছেন। তাঁর তীর একজন শত্রুর গায়ে বিধল। সে ছিল অত্যন্ত মোটা এবং সে-ই সবার আগে পালানোর চেষ্টা চালায়। তীর খেয়ে সে মাটিতে পড়ে যায়।

তারপর মারাত্মকভাবে টমার আহত হওয়া এবং তাদের মহা ক্রুশ মুসলমানদের হাতে এসে যাওয়ায় তাদের মনোবল একেবারে ভেঙে যায়। এরপর দফায় দফায় যুদ্ধ হলেও আগের সেই শৌর্য-বীর্য ছিল না তাদের। তারপর টমা তার সাথীবর্গসহ আত্মসমর্পণ করল। এভাবেই একটি শক্তিশালী দূর্গ মুসলমানদের পদানত হল।

কোথায় পাব এমন জননী?

মরুপ্রান্তর। ধূসর মরুসাগর। দৃষ্টিসীমার শেষ পর্যন্ত বালি আর বালি। মাঝে মাঝে ছড়িয়েছিটিয়ে আছে উপল খণ্ড। দুপুরের প্রখর রোদে বালুকণাগুলো অগ্নিস্ফূলিঙ্গের মতো দুরন্ত বাতাসের সঙ্গে দাপাদাপি করে। আবার বিকেলের স্নিগ্ধ শীতলতায় অপূর্ব হিমেল বায়ুপ্রবাহ ছুটে বেড়ায়। এই তাপদগ্ধ ও স্নিগ্ধ

শীতলতার মাঝে ছোট একটি নগরীর নাম ইয়াসরিব। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে হিজরত করে আসার পর একে মদীনাতুর রাসূল বলা হয়। খেজুর বৃক্ষের সবুজ প্রান্তরের মাথায় বহুকষ্টে, বহু চড়াই-উৎরাইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে।

দূর আকাশে অনুপম চাঁদ মিটিমিটি জ্বলছে। মুখে নিটোল হাসি। নিঝুম নিস্তব্ধ রজনী। ঊর্ধ্বলোকের বাতায়ন খুলে তারকারাজি মিট্‌মিট্ করে তাকিয়ে আছে। শুধু মেঘমালা ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে অজানা লোকে। স্বর্গীয় স্নিগ্ধ সুষমায় সিক্ত মদীনা নগরী তখন ঘুমে অচেতন। ক্রমে রাত গড়িয়ে সুবহে সাদেক হল। আলোকচ্ছটায় পূর্বাকাশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অপসৃয়মান অন্ধকারের বুক চিরে একটি কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ল মদীনার অলিতেগলিতে।

হাইয়্যা আলাল জিহাদ। হে মুজাহিদেরা! হে রাসূলের সাহাবারা! ইসলাম আজ উষ্ণ রক্তে ধন্য হতে যাচ্ছে। ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে স্তব্ধ করতে সমবেত হয়েছে। তোমরা জিহাদে চল।

হযরত বেলাল রাযি.-এর ডাকে অচেতন মদীনা শিউরে উঠল। চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

পথের বাঁকে এক জীর্ণ কুঠিরে এক বিধবা মহিলা তার ছোট্ট পুত্রসন্তানকে বুকে জড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। হযরত বেলাল রাযি.-এর কণ্ঠস্বরে তাঁর ঘুম ভেঙেছিল। জিহাদের ডাক! হৃদয়টা ছ্যাৎ করে উঠল। অশ্রুতে চোখদুটো ঝাপসা হয়ে এল। মানসপটে ভেসে উঠল প্রিয়তম স্বামীর স্মৃতিবিজড়িত অন্তিম মুহূর্তগুলো যখন শাণিত তরবারি তুলে দিচ্ছিলেন স্বামীর হাতে। তারপর অশ্বের পদাঘাতে ধূলিঝড় উড়িয়ে তিনি চিরবিদায় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন বদর অভিমুখে।

কিন্তু তারপর? তারপর ফিরে আসছিলেন শহীদের খুনরাঙা আবরণে। অধরে লেগে ছিল অপূর্ব একফালি জান্নাতি হাসির রেখা। রক্তে জান্নাতি খোশবু। তিনি আজ বহুদূরে, জান্নাতের মনোরম উদ্যানে। কিন্তু আমি? আমি হতভাগিনী রয়ে গেলাম। চির দুঃখিনী আমি। কল্পনার অসহ্য যাতনায় অশ্রু ঝরতে লাগল অঝোর ধারায়। ডুকরে কেঁদে উঠল বিধবা। অশ্রুর উষ্ণ পরশে, কান্নার ক্ষীণ আওয়াজে এতিম বালকটির ঘুম ভেঙে গেল। হতবিহ্বল হয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল। মায়ের মুখের দিকে সে নিস্পলক তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলল, মা, কাঁদছ কেন? কী হয়েছে তোমার? আবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। ওষ্ঠধর কাঁপতে লাগল। শত চেষ্টা

করে আর কিছু বলতে পারল না এতিম বালকটি।

ছেলের কপালে মা তাঁর গভীর মমতার আবেশে চুম্বনরেখা এঁকে দিলেন। পরম স্নেহে ছেলের চুল নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, বাবা! আজ ইসলামের বড় দূর্দিন। জিহাদের ডাক এসেছে। তোর আব্বা থাকলে তাঁকে জিহাদে পাঠাতাম। তিনি নেই। তুমিও ছোট। কাকে রাসূলুল্লাহর সাথী করে জিহাদে পাঠাব?

বালকপুত্র শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, মা আপনি কাঁদবেন না। আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে নিয়ে চলুন। তিনি যদি আমাকে জিহাদে কবুল করে নেন তবে তো মহাসৌভাগ্য। এখনই চলুন।

ছেলের কথায় মায়ের অবারিত কপাট খুলে ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়া প্রবেশ করল। বিধবা দারুণ আনন্দিত হলেন ছেলের কথায়। চুমুতে চুমুতে ভরে দিলেন ছেলের সারাদেহ। তারপর অপলক তাকিয়ে রইলেন প্রিয় কলিজার টুকরার দিকে।

ফজর নামাযের পর মসজিদ-চত্বরে এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হল। সারিবদ্ধ প্রবীণ মুজাহিদদের সঙ্গে নবীন মুজাহিদের দল এসেও উপস্থিত। চোখে-মুখে আনন্দের ফল্গুধারা। বুকে অসীম সাহস, হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত উল্লাস, আর প্রশান্তি। খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সেনাপতি। আল্লাহ তাঁদের পরিচালক। সুতরাং বিজয় তো তাঁদেরই।

একটু পর ভরমজমায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরিফ আনলেন। কিশোর মুজাহিদদের তিনি আদরে সোহাগে বুঝিয়ে ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। এমন সময় বিধবা মহিলাটি তার ছেলেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি আশা-নিরাশার দোলায় দুলছেন। আলো আঁধারে এক অপূর্ব মিলন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার মুখাবয়বে।

আবেগমাখা কণ্ঠে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ছেলেটি আমার জীবনের একমাত্র সম্বল। আমার দ্বিতীয় কোনো সন্তান নেই। ওর পিতা আপনার সঙ্গে বদরের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছেন। তাই আপনার দরবারে আমার আবেদন, দয়া করে ওকে জিহাদে কবুল করে নিন। এর বদৌলতে আমি কিয়ামতের দিন মুজাহিদদের মায়ের সঙ্গে দাঁড়াতে চাই।

আবেগদীপ্ত চেতনায় উদ্দীপিত মহিলার কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই খুশি হলেন। মুগ্ধ হলেন উপস্থিত সাহাবাগণও। শহীদ পিতার কথা শুনে আবেগাকুল হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেটিকে কাছে টেনে নিলেন। আদরে ভরে দিলেন তাকে। পরম স্নেহে বললেন, তুমি এখন কিশোর। আর একটু বড় হও। তখন তোমাকে জিহাদে নিব, কেমন?

ছেলেটি তখন করুণ আবেদনের সুরে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আম্মা যখন চুলোয় আগুন ধরান তখন দেখি ছোট-ছোট খড়িগুলোই চুলোয় আগে দেন। আমিও কি জিহাদের ময়দানে ছোট খড়ি হতে পারি না? ছেলেটির অপূর্ব বুদ্ধিমত্তায় দারুণ বিস্মিত হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি তার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলেন ছেলেটির নিষ্পাপ মুখের দিকে। তারপর একরাশ প্রশান্তিতে ভরে উঠল তাঁর চোখের মণি। আনন্দে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাকে বললেন, হে ভাগ্যবতী নারী! আল্লাহ তোমার ছেলেকে কবুল করেছেন। তোমার প্রতি আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হয়েছেন। তুমি কিয়ামতের দিবসে মুজাহিদদের মায়েদের সঙ্গেই থাকবে!

নবীপ্রেমে পাগলপারা এক নারী

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন না করায় অহুদযুদ্ধে সত্তরজন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। সত্য দীনের আহ্বানে জিহাদের প্রেরণা অন্তরে জাগ্রত রাখতে তাঁদের সর্বদা উদ্বুদ্ধ করেছে। শত বিপদ, বালা-মুসিবত, শত বাঁধা-বিপত্তি পেরিয়ে তাঁরা লাভ করেছেন জীবনে পূর্ণতা। অহুদের যুদ্ধ নবীন মুজাহিদদের এই সুযোগ দান করেছিল।

মুসলমানদের এই প্রাণদান ব্যর্থ হয় নি। বৃথা যায় নি। সে ছিল এক পরম পরীক্ষার দিন! সংবাদ রটে গেল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাত বরণ করেছেন। এ-মহা দুঃসংবাদে অনেক মুজাহিদ ভেঙে পড়লেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন অনেকেই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু বেঁচে নেই তাহলে আর যুদ্ধ করে লাভ কি? যুদ্ধ করব কার জন্য? এ ভাবনা ছিল অনেকেরই।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরকে দৃঢ় করে দিলেন। আবার দুর্বার গতিতে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। ফলে প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত জয়

মুসলমানেরই পদচুম্বন করল। যদিও ক্ষয়-ক্ষতি মুসলমানদের বেশি হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই শাহাদাতের মিথ্যা সংবাদ শুনে মদীনার এক আনসার রমনি পাগলপারা হয়ে ছুটছেন অহুদের প্রান্তরে। উদ্দেশ্য, সঠিক সংবাদ জানা।

পথেই পড়ল একজন যুদ্ধ-ফেরত সাহাবী। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদ কি? তিনি কেমন আছেন? জলদি বল!

সাহাবীর জানা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরাপদে আছেন। তাই সে তাঁর প্রশ্নের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে উত্তর দিল, তোমার পিতা শাহাদাত বরণ করেছেন।

নিজেকে সংযত রেখে মহিলা আবার জিজ্ঞেস করলেন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদ বল? তিনি জীবিত আছেন কি না?

লোকটি কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, তোমার ভাই শহীদ হয়ে গেছেন।

বিচলিত কণ্ঠে মহিলার সেই একই প্রশ্ন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? এবারও লোকটি তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, তোমার স্বামীও এ-যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছেন।

এবার মহিলাটি বিরক্ত হয়ে রাগত স্বরে বললেন, আমার পিতা, ভাই, স্বামী শাহাদাত বরণ করেছেন কি না তা তোমাকে জিজ্ঞেস করি নি। তুমি দয়া করে আমাকে বল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? তখন লোকটি বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত এবং নিরাপদেই আছেন।

মুহূর্তে তাঁর চিন্তিত মুখে আনন্দের দ্যুতি খেলে উঠল। উল্লাসিত হয়ে বলে উঠলেন, পিতা, ভাই ও স্বামীর আত্মদান তবে বৃথা যায় নি। ব্যর্থ হয় নি। তাঁরা মরেও লাভ করেছেন অনন্ত জীবন।

কেননা একটি উৎসর্গীকৃত জীবন সত্যের আলো ও আহ্বানকে আরো তীব্রতর, আরো জ্যোতির্ময় করে তোলে।

ইসলামের প্রথম যুগে একদল বিশ্বাসী ও নির্ভীক মুসলমান সকল বাঁধা-বিপত্তি ও মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ মনে করেছিল বলেই ইসলামের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হয়েছে। শান্তির বাণী পৃথিবীময় প্রচারিত হয়েছে। আটলান্টিক মহাসাগর

থেকে সুদূর প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত এই শান্তির বাণীর বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে।

ফাতিমা বিনতে খাত্তাব রাযি.

দ্বিতীয় খলীফা আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর রাযি.-এর বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব রাযি.। তাঁর স্বামীর নাম সাঈদ ইবনে যায়েদ। ইসলামের সূচনা-লগ্নেই তারা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেন।

হযরত ওমর রাযি. তখনও কুফুরের আঁধারে নিমজ্জিত। শুধু তাই নয়, বরং তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম সারির শত্রু। তিনি ছিলেন কঠোর চরিত্রের লোক। এ-বিষয়টি ওমর রাযি.-এর বোন ও ভগ্নিপতি সম্যক অবগত ছিলেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, বিষয়টি ওমরের কানে গেলে পরিণতি কী হবে ভালোভাবেই জানা ছিল তাঁদের। তাই নিজেদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রেখেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। ইসলামের হুকুম-আহকাম মেনে চলতেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যদি কিছু প্রকাশ করতে চান, পৃথিবীর কেউ তা গোপন রাখতে পারেন না। এখানেও তাই হল। সেটাও আবার এমন সময় যখন হযরত ওমর রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার জন্য নাঙা তলোয়ার নিয়ে ছুটছে। যে করেই হোক মুহাম্মাদের অস্তিত্ব চিরতরে শেষ করে দিতে হবে।

কিছুক্ষণ পূর্বেই কাফেরদের সভাস্থল হতে বেরিয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ক্ষিপ্রগতিতে ছুটছে ওমর। তার গতিরোধ করে পুরো আরবে এমন কেউ নেই। কেউ কোনো কথা বলছে না। তবে অনুমান করছে আজ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। গাছ-পাতা, লতাগুল্মও যেন নীরব হয়ে দেখছে এই দৃশ্য। ক্রোধে তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেছে।

হঠাৎ পথে দেখা হল হযরত সা'দ রাযি.-এর সঙ্গে। তিনি ইসলাম গ্রহণ করছেন। বিষয়টি তখনও গোপন ছিল কাফেরসমাজে। তিনি ওমরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এভাবে কোথায় যাচ্ছ ওমর?

ওমরের স্পষ্ট উত্তর, মুহাম্মাদের শির আনার জন্য।

কেঁপে উঠলেন ঈমানে উদ্বেলিত হযরত সাদ রাযি.। বললেন, তুমি কি মনে কর বনি হাশেম ও বনি আবদে মানাফ তোমাকে এমনিতেই ছেড়ে দিবে?

ওমরের ক্রোধ আরো কয়েকগুণ বেড়ে গেল। যেন সা'দকে গিলে ফেলে।

ওমর বললেন, মনে হচ্ছে তুমিও মুহাম্মাদের দীন গ্রহণ করেছ? সুতরাং

তোমাকে দিয়েই শুরু করি।

হযরত সা'দ রাযি. বললেন, আমি এর জন্য প্রস্তুত। তবে প্রথমে নিজের ঘর সামলাও।

তার মানে? রাগতস্বরে প্রশ্ন ওমরের।

হযরত সা'দ রাযি. বললেন, তোমার বোন, ভগ্নিপতিও যে মুসলমান হয়ে গেছে সে খবর কি রাখ?

ওমরের মাথায় যেন পাহাড় ভেঙে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গতি পরিবর্তন করে দিল। দ্রুত ঘোড়া হাঁকাচ্ছে ভগ্নিপতির বাড়ির দিকে। ওমর পৌঁছে গেল বোন ফাতিমার ঘরের সামনে। দরজা বন্ধ। ভিতর থেকে পবিত্র কুরআনুল কারীমের মনোলোভা আওয়াজ ভেসে আসছে। বোঝা গেল বোন ও ভগ্নিপতি মুহাম্মাদের ধর্ম কবুল করে নিয়েছে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না ওমর। ক্রোধে যেন ফেটে পড়তে যাচ্ছে। দরজায় আঘাত হানল ওমর। সিংহের ন্যায় গর্জন করে বলল, দরজা খোল।

হঠাৎ ওমরের আওয়াজে ঘাবড়ে গেল ফাতিমা ও তাঁর স্বামী। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন।

আজ বুঝি আর রক্ষা নেই। তাড়াতাড়ি কুরআনুল করীমের পাতাগুলো লুকিয়ে রাখলেন তাঁরা। আর কুরআনের তালিম দিতে আসা গৃহ-শিক্ষক সাহাবীকে ঘরের গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখলেন।

এরপর দরজা খুলে দিতেই ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ভগ্নিপতির উপর ওমর। তরবারির আঘাতে আঘাতে হযরত সাঈদ রাযি.-এর দেহ রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। কিন্তু তিনি কিছুতেই ইসলাম ত্যাগ করতে সম্মতি প্রকাশ করলেন না। যাঁদের হৃদয়রাজ্যে ইসলামের আলো একবার প্রবেশ করে শত ঝড়-বৃষ্টিতেও তা নেভে না, ওমরের তা জানা ছিল না। ওমর ভাবছিল তার ধমক ও মারপিটে বুঝি সব আদায় করা যাবে।

স্বামীর এই করুণ অবস্থা দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না হযরত ফাতিমা রাযি.। স্বামীকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে গেলেন তিনি। তাঁরও দেহ হতে রক্ত ঝরতে লাগল। এমন চরম নির্যাতনের মধ্যেও বিচলিত হলেন না ঈমানে উজ্জীবিত ফাতেমা বিনতে খাত্তাব রাযি.। কঠোর স্বভাবের অধিকারী ভাইয়ের মুখের উপর বলে দিলেন, ওমর! অনেক ভয় করেছি। আর না। জেনে রেখ, তুমি আমাদের প্রাণ হরণ করতে পারবে। কিন্তু এই ধর্ম হতে এক

চুলও হটাতে পারবে না।

বোনের কথায় অবাক হয়ে গেলেন হযরত ওমর। তাকালেন বোনের দিকে। দেখলেন রক্ত ঝরছে বোনের দেহ হতে। এত নির্যাতনের মধ্যে এরা কেন ইসলাম ত্যাগে সম্মত হচ্ছে না? কেন? কোন্ শক্তি তাঁদের সহায়তা করছে। ভাবান্তর সৃষ্টি হল হযরত ওমরের মধ্যে। তিনি নিজেকে সংযত করে নিলেন। এরপর কিছুটা নরম সুরে বললেন, আচ্ছা! তোমরা কী পড়ছিলে? আমাকে কি একটু দেখাবে?

বোন ফাতিমা বললেন, তুমি হচ্ছ নাপাক। পবিত্র কালামুল্লাহ নাপাক হাতে দেওয়া যায় না। তবে হ্যাঁ, যদি দেখতে চাও তাহলে প্রথমে গোসল করে এস। পবিত্র হও। ওমর বাধ্য শিশুর মতো বোনের হুকুম পালন করলেন। এরপর তিনি কুরআনের আয়াতগুলো হাতে তুলে নিলেন। সূরা ত্বহার কিছু আয়াত লেখা ছিল তাতে। তিনি আয়াতগুলো পড়তে শুরু করলেন। আয়াতগুলো পড়ছিলেন আর চক্ষু হতে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরছিল। হযরত ওমরের জীবনে সৃষ্টি হল এক বিপ্লব। পালটে গেল জীবনের কায়া। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, আমাকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে চল। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করলেন।

হযরত ওমর রাযি.-এর বোন কঠিন পরিণতির কথা জানা সত্ত্বেও যেভাবে নির্ভীকচিত্তে ঘোষণা দিয়েছিলেন, মুসলিম মহিলাদেরও যে কোনো কঠিন মুহূর্তে ইসলামের জন্য সে রকম দৃঢ়তা অবলম্বন করা অপরিহার্য।

হযরত হিন্দা এখন রণাঙ্গনে

বিখ্যাত কুরাইশ-নেতা উতবা বিন রাবিয়ার কন্যা হযরত হিন্দা। তার প্রথম বিবাহ হয়েছিল ফাতাহ বিন মুগিরার সঙ্গে। এ-বিবাহ বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। কিছুদিনের মধ্যেই পারস্পরিক কলহের দরুণ সম্পর্ক ভেঙে যায়। পরবর্তী বিবাহ হয় প্রসিদ্ধ কোরেশ-দলপতি আবু সুফিয়ান রাযি.-এর সঙ্গে।

মরুআরবে ইসলামের সূচনাকালে হযরত হিন্দা রাযি., তার পিতা ও স্বামী ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম সারির দুশমন। 'মুহাম্মাদ' নাম শুনলেই জ্বলে উঠত তাদের দেহ-মন।

দ্বিতীয় হিজরীতে ইসলামী ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বপ্রথম

যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর মহা বিজয় ঘটে। ভেঙে যায় কুরাইশ-বাহিনীর কোমর। নিহত হয় তাদের বহু নেতাকর্মী। এদের মধ্যে ছিল ইসলামের প্রধান শত্রু আবু জাহল। ছিল হিন্দার পিতা উতবাও। তাকে হত্যা করেছিল হযরত হামযা রাযি.।

উতবা নিহত হওয়ার পর আবু সুফিয়ান তার স্থলাভিষিক্ত হয় এবং কাফের-গোষ্ঠীর পরবর্তী যুদ্ধগুলো তার নেতৃত্বেই সজ্ঘটিত হয়। বিশেষভাবে অহুদ যুদ্ধ তারই আবেগপূর্ণ প্রতিশোধের ফল।

এই যুদ্ধে বিশেষভাবে শরিক ছিল তার স্ত্রী হিন্দা। পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর ছিল এই হিন্দা। এই উদ্দেশ্যে যোবাইর বিন মুতয়িমের গোলামকে আগে থেকেই প্রস্তুত রেখেছিল। কারণ ওয়াহশি ছিল নেজা নিক্ষেপে খুবই পারদর্শী।

শুরু হল যুদ্ধ। ঐতিহাসিক অহুদযুদ্ধ। হক-বাতিলের যুদ্ধ। দুনিয়া থেকে ইসলামকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে মক্কার কাফেররা কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে আজ। এদিকে ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদরাও বসে নেই। সংখ্যায় তারা অতি নগণ্য হলেও আবেগ-উচ্ছ্বাসের এতটুকু কমতি নেই।

এ-দিকে যুদ্ধের ময়দানে পাথরের আড়ালে ওত পেতে বসে আছে ওয়াহশি। তার একমাত্র টার্গেট হিন্দার পিতার হত্যাকারী হযরত হামযা রাযি.।

এমনি মুহূর্তে হযরত হামযা রাযি. সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এমন সুবর্ণ সুযোগই খুঁজছিল ওয়াহশি। হযরত হামযা রাযি. সম্মুখে এগিয়ে গেলেন। ঠিক তখনি একটি বিষাক্ত নেজা কোমর ভেদ করে বেরিয়ে গেল।

বিষাক্ত নেজার আঘাতে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হযরত হামযা রাযি.।

হযরত হামযার শাহাদাতের সংবাদ শুনে হিন্দার সঙ্গীরা আনন্দে গান গাইতে শুরু করে। প্রতিশোধ স্পৃহায় হযরত হামযা রাযি.-এর বুকচিরে কলিজা বের করে আনে হিন্দা এবং তারপর তা চিবোতে থাকে। কিন্তু গলাধঃকরণ করতে পারছিল না। বাধ্য হয়ে উগরে ফেলতে হয়।

এ-দুঃখজনক সংবাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত হন। হযরত হামযা রাযি.-এর লাশ দেখে নিজেকে আর ধরে রাখতে

পারলেন না তিনি। বুক চিরে চিৎকার বেরিয়ে আসে। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কারোর মৃত্যুতে এত জোরে কাঁদেন নি।

এরপর অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। কালের আবর্তে অষ্টম হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় করে নেন। দশ হাজার আত্মত্যাগী সাহাবীর এক বিশাল বাহিনী নিয়ে অত্যন্ত শৌর্য-বীর্যের সঙ্গে বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন। আজ এমন কোনো শক্তি নেই যে এই মহান বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়াবে। মুসলমানদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন কেউ নেই আজ। প্রতিশোধ নিলে ঠেকানোর কেউ নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন পরম উদার মানবিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

জীবন শত্রুদের এভাবে ক্ষমা করার উপমা পৃথিবী কখনও দেখে নি। মানব ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন তিনি।

হযরত আবু সুফিয়ান রাযি. মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিলেন তিনি। হিন্দার নিকটও ইসলামের সত্যতা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি কয়েকজন সত্যান্বেষিণী মহিলার সঙ্গে বোরকা আবৃত হয়ে দরবারে রেসালাতে হাজির হয়ে গেলেন।

অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমায়িক মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে ইসলাম কবুল করলেন হিন্দা। সেদিন থেকে হিন্দা হলেন রাযিয়াল্লাহু আনহা।

তখন তিনি হৃদয়ের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বললেন, ইতোপূর্বে কুফুরি অবস্থায় আপনার চেয়ে অধিক ঘৃণিত দুশমন আমার কেউ ছিল না। আর আজ আমার মনে হচ্ছে আপনার চেয়ে পরম প্রিয় দুনিয়ায় আমার কেউ নেই। তিনি আবেগ আর চেপে রাখতে পারলেন না। বাধভাঙা জোয়ারের ন্যায় তার অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। এরচেয়ে মূল্যবান কিছু দরবারে রেসালাতে দেওয়ার মতো আপাতত তার কাছে নেই।

এরপর ঘরে গেলেন। ঘরে ঢুকতেই মূর্তিগুলো সামনে পড়ল তাঁর। ঈমানি জোশ খেলে গেল পুরো তনুমনে। সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো মূর্তি ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। আজ সবচেয়ে বড় শত্রু তাকেই মনে হল। ইসলামের

ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়ার পর হযরত হিন্দা রাযি. নিজের জীবনকে সর্বাত্মকভাবে ইসলামের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন।

হযরত ওমর রাযি.-এর শাসনামলে সিরিয়ায় অভিযানকারী মুজাহিদদের সঙ্গে তিনি নিজের স্বামীসহ শরিক হলেন এবং এ-যুদ্ধে উভয়েই অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে আবেগাপ্লুত হয়ে ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলা করলেন, যা মূলত ইসলাম কবূলের পূর্বে ইসলামের সঙ্গে শত্রুতার কাফফারা।

সিরিয়ায় সঙ্ঘটিত যুদ্ধসমূহের মধ্যে ইয়ারমুকের ঐতিহাসিক যুদ্ধ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ-যুদ্ধে রোমসম্রাট তার সকল শক্তি প্রয়োগ করে। এ-প্রসিদ্ধ যুদ্ধেও হিন্দা রাযি. ও আবু সুফিয়ান রাযি. অত্যন্ত বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন। কখনো যদি শত্রুদের প্রচণ্ড হামলায় মুসলিমবাহিনীর পিছুটান অবস্থা হত, তখন বীরাঙ্গনা মুসলিম রমণীগণ তাঁবুর খুঁটি বা পাথর উঠিয়ে শত্রুর উপর আক্রমণ করত। হযরত হিন্দা রাযি. তখন যুদ্ধের গান গেয়ে মুজাহিদদের উত্তেজিত ও উজ্জীবিত করে তুলতেন। যার দ্বারা মুসলিম বাহিনী হারানো হিম্মত ফিরে পেত।

এমনি এক বিশেষ মুহূর্তে তিনি তাঁর স্বামী আবু সুফিয়ানকে পিছুটান হতে দেখলে অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম, তুমি আল্লাহর দীনের বিরোধিতায় এবং আল্লাহর হাবীবের মোকাবেলায় বড় বাহাদুর ছিলে। তাই আজ সুযোগ এসেছে প্রায়শ্চিত্ত করার। সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক দীনের বিজয়ের জন্য এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করে মহান প্রভুর প্রিয় হয়ে যাও। আর মনে রেখ, সুযোগ কিন্তু সব সময় আসে না।

কথাগুলো হযরত আবু সুফিয়ানের আত্মসম্মানে আঘাত হানল এবং তাঁর ঘুমন্ত আত্মা জেগে উঠল। এরপর তিনি অত্যন্ত বীরবিক্রমে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনলেন।

এ-যুদ্ধে এক সুযোগে রোমবাহিনী মুসলিম মহিলা শিবিরের সন্নিকটে এসে যায়। তখন মুসলিম মহিলাগণ তাদের উপর সর্বশক্তি নিয়ে আক্রমণ করে তাদেরকে হটিয়ে দেয় এবং অনেককে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দেয়। এসব বীরাঙ্গনা মহিলার মধ্যে হযরত হিন্দাসহ উম্মে আবান, উম্মে হাকিম ও খাওলা বিনতে আজওয়ারও শামিল ছিলেন।

হযরত হিন্দা ছিলেন আত্মসম্মানী, বিশ্বাসী, জ্ঞানী এবং অত্যন্ত

উদারচিত্তের অধিকারিণী। সন্তানদের মধ্যে হযরত আমির মুয়াবিয়া রাযি. ইসলামী ইতিহাসের অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। হযরত উসমান রাযি.-এর শাসনামলে এই মহান বীরাঙ্গনা আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান।

রণাঙ্গনে হযরত উম্মে সুলাইম রাযি.

প্রকৃত নাম সাহলা। উম্মে সুলাইম তার ডাকনাম। এ-নামেই তিনি ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেছেন। তিনি মদীনার প্রসিদ্ধ বনু নাজ্জারের কন্যা। পিতার নাম মিলহান। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খালা হওয়ার অনন্য গৌরব অর্জন করেন। তিনি প্রথমে মালেক ইবনে নাজ্জারের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু তাঁর হতভাগা স্বামী বেঁকে বসল। পৈত্রিক ধর্মত্যাগে বাঁধা হয়ে দাঁড়াল তাঁর স্বামী। ফলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং এখানেই তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

পরবর্তী সময়ে উক্ত গোত্রেরই আবু তালহা নামক এক ব্যক্তি তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তখনও আবু তালহা ইসলামে দীক্ষিত হয় নি। তাই উম্মে সুলাইম আবু তালহাকে ইসলামে প্রবেশের আহ্বান জানান। তিনি যেই কৌশলে আবু তালহাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান ইতিহাসের পাতায় তা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। ইসলামের দিকে আহ্বান সংক্রান্ত হযরত উম্মে সুলাইমের কথোপকথন ছিল এরকম।

উম্মে সুলাইম বললেন, আবু তালহা! তুমি কি জান, তোমার প্রভু এই জমিন হতে সৃষ্ট?

আবু তালহা বলল, হ্যাঁ, তা তো বটেই।

উম্মে সুলাইম বললেন, তা হলে বৃক্ষের পূজা করতে তোমার লজ্জা হয় না?

আবু তালহা তার যুক্তিপূর্ণ কথায় এতটাই প্রভাবিত হলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তাদের বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়।

উম্মে সুলাইম রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কার অনেক যুদ্ধে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক যুদ্ধে উম্মে সুলাইমসহ অনেক আনসারি সাহাবীয়াকে সঙ্গে রাখতেন, যাঁরা যুদ্ধের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিশেষ অবদান রাখতেন।

অহুদযুদ্ধে মুসলমান যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করছিল, সেই কঠিন মুহূর্তেও উম্মে সুলাইম রাযি. অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে মুজাহিদদের সহযোগিতা করেছিলেন। এ-সম্পর্কে বুখারি শরীফে একটি হাদীস এসেছে। হযরত আনাস রাযি. বলেন, অহুদযুদ্ধের সেই করুণ ও কঠিন পরিস্থিতিতে আমি উম্মাহাতুল মুসলিমীন হযরত আয়েশা রাযি. ও হযরত উম্মে সুলাইম রাযি.-কে দেখেছি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে এবং মশক ভরে পানি এনে আহত মুজাহিদদের পান করাতে। এভাবে মুসলিম রমণীরা বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মুজাহিদদের উৎসাহ প্রদান করতেন এবং সাহস যোগাতেন।

হুনায়নের যুদ্ধে হযরত উম্মে সুলাইম রাযি. সঙ্গে একটি ধারালো খঞ্জর রেখেছিলেন। এ-দৃশ্য দেখে তাঁর স্বামী হযরত আবু তালহা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি অবগত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, যদি কোনো মুশরিক আমার নিকট আসে এর দ্বারা তার পেট চিরে দেব।

এ-কথা শুনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন। মুসলিম ইতিহাসের এই বীরাঙ্গনা তাঁর পুত্র হযরত আনাস রাযি. কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতের জন্য স্থায়ীভাবে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন। তাঁর ঘরে বসে রাহমাতুল্লিল আলামিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র মক্কার নির্যাতিত, নিরীহ মুহাজির ও উদারতার উজ্জ্বল প্রতীক আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃবন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন। হযরত উম্মে সুলাইম রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই উম্মে সুলাইমের বাড়ি যেতেন এবং দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম নিতেন। তিনি যখন দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম নিতেন এবং যখন তিনি জেগে উঠতেন তখন উম্মে সুলাইম রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরের পবিত্র ঘাম শিশিতে ভরে রাখতেন। চুল মোবারক সংগ্রহ করতেন এবং তা অত্যন্ত যত্নসহকারে হেফাজত করে রাখতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁকে খুব মুহাব্বত করতেন। উম্মে সুলাইমের ছোট একটি ছেলে ছিল, নাম ওমায়ের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে খুব মুহাব্বত করতেন এবং তাঁর বাড়ি গেলে ওমায়েরের সঙ্গে কৌতুক করতেন। ওমায়েরের ছিল ছোট্ট একটি পাখি। ছোট পাখিকে আরবীতে নুগার বলে। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বাড়ি গিয়ে দেখেন ওমায়ের খুব গম্ভীর মুখে বিষণ্ন অবস্থায় বসে আছে। পাশেই নুগার মৃত পড়ে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য কৌতুক করে বললেন, يا عمير ما فعل النغير। অর্থাৎ হে ওমায়ের! তোমার নুগায়েরের কি হল?

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই একটি উক্তির উপর গবেষণা করে পরবর্তী সময়ে আইম্মায়ে মুজতাহিদগণ ২০০ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন। সুবহানাল্লাহ!

হযরত উম্মে সুলাইম ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও আত্মসম্মান-বোধসম্পন্ন মহিলা। পুত্র ওমায়েরের ইন্তেকালে যেই অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন ইতিহাসে এর উপমা বিরল।

খন্দকের যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে নিজ হাতে খন্দক খনন করছেন। বড় করুণ অবস্থা বিরাজ করছিল তখন মুসলমানদের মধ্যে। পেটে আহার নেই। অনাহারে অর্ধাহারে দিন-রাত বিরামহীন খন্দক খনন করে চলছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। একদিকে শত্রুর আগমনবার্তা। অপরদিকে ক্ষুৎ-পিপাসা। সব মিলিয়ে এক অগ্নীপরীক্ষা সাহাবায়ে কিরামের সামনে। অধিকাংশ সাহাবী পেটে পাথর বেঁধে কাজ করছিলেন। একজন সাহাবী ক্ষুধার জ্বালা আর সহ্য করতে না পেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে পেটে একটি পাথর বাঁধা দেখালেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্মিত হেসে আস্তে করে নিজের চাদর তুললেন। সাহাবী তো হতবাক। একি! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেটে দুটো পাথর!

এই করুণ অবস্থায় হযরত উম্মে সুলাইম রাযি. তাঁর স্বামীকে বললেন, যান, ঘরে কিছু খাবার আছে। তৃপ্তিসহকারে দুজনের খাওয়া চলবে। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আস্তে করে বলুন, তিনি যেন এখনই তাশরিফ আনেন।

হযরত আবু তালহা রাযি. চললেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করতে। কিন্তু কাছে গিয়ে তিনি হয়রান হয়ে পড়লেন। এত মানুষের ভিড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিভাবে বলবেন দাওয়াতের কথা? তবু ধীরে-ধীরে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন, হুযূর, আপনি চলুন, আমার ঘরে আপনার জন্য কিছু খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কঠিন অনাহারের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আহারের দাওয়াত এল। দয়ার নবী কিভাবে তাঁর ক্ষুধার্ত সাহাবীদের রেখে একাকী যাবেন?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পার্শ্ববর্তী সাহাবীকে বললেন, যাও, সবাইকে আসতে বল। আজ আবু তালহার বাড়িতে দাওয়াত আছে।

প্রাই দুই হাজার সাহাবীর এক বিশাল বাহিনী নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালহার বাড়িতে উপস্থিত।

এদিকে হযরত উম্মে সুলাইম রাযি. ও হযরত আবু তালহা রাযি. তো পেরেশান। এত লোকের আয়োজন তিনি কিভাবে করবেন? অথচ ঘরের খানা বড়জোড় দু-তিনজনের হবে।

গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন তাঁরা। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাকলেন আবু তালহা, খানা হাজির করো। আর হ্যাঁ, আমি গোশত দিতে থাকব আর তুমি রুটি দিয়ে যাবে। আর শোনো, পাতিলের মধ্যে তাকাবে না কিন্তু!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই দু-তিনজনের খাবার প্রায় দুই হাজার সাহাবীসহ তৃপ্তিসহকারে খেলেন। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোজেজা।

হযরত উম্মে সুলাইম রাযি.-এর ফজিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উক্তিটিই যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি জান্নাতে গিয়ে কারো যেন পদধ্বনি শুনতে পেলাম। জানতে চাইলাম এ কার পদধ্বনি? উত্তরে বলা হল, এটা আমাদের মাতা গুমাইছা বিনতে মিলহানের পদধ্বনি। -মুসলিম শরিফ ১০৫

বীর নারী হিবার আত্মোৎসর্গ

নাম হিবা দারাগামেহ। বয়স ১৯ বছর। পশ্চিম তীরের তুবাস শহরে তার বাড়ি। আলকুদুস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অসম্ভব মেধাবী ছাত্রী। কখনো কোনো পুরুষের সঙ্গে কথা বলে নি সে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটিরায় কখনো এক কাপ চা বা কফি পান করে নি। তার আপাদমস্তক সর্বদা বোরকায় আবৃত থাকত। বাইরের বিশ্ব তার বাদামি রঙের চোখদুটো দেখতে পেত। হিবার বান্ধবী ছিল শুধু মেয়েরা।

একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তার চাচাতো ভাই রাদ দারাগামেহ জানান, আমি কখনো তার মুখ দেখি নি। কখনো তার সঙ্গে কথা বলি নি, হাতও মিলাইনি কখনও। বিশ্ব তার অনাবৃত মুখ প্রথম দেখতে পায় একটি পোস্টারে। ২০০৩ সালের ১৯ মে এক আত্মঘাতী হামলায় হিবা শাহাদাত বরণ করার পর তার পোস্টার প্রকাশ করে। হিবা আত্মঘাতী হামলাকারিণী। ইসলামী জিহাদের সদস্য হিবা ইসরাইলের উত্তরাঞ্চলীয় শহর আফুলায় একটি বিপণী কেন্দ্রের বাইরে ওই আত্মঘাতী হামলা চালায়। হামলায় তিন জন ইসরাইলি ইহুদি নিহত এবং অপর তিন জন আহত হয়।

২০০৩ সালের ১৯ মে সকালে হিবা অন্যান্য দিনের মতো বাড়িতে আসে। সে দিনটির কথা স্মরণ করতে গিয়ে হিবার মা ফাতিমা বলেন, হিবা যথারীতি ভোরে ঘুম থেকে জেগে ফজরের নামায আদায় করে। এরপর বাড়ির সবার জন্য সে চা নাশতা তৈরি করে। আমরা সবাই তার বানানো নাশতা খেলাম। এরপর হিবা সমস্ত থালা-বাসন ধুয়ে রাখল। তারপর দেখি হিবা বাড়ির বাইরে বাগানে, যেখানে রয়েছে কাঠবাদাম, জলপাই ও ডালিম গাছ, রয়েছে গোলাপের বেশ কয়েকটি গাছ। হিবা গাছগুলোতে পানি দিচ্ছে প্রশান্ত মনে। এ সময় দেখি সে একটি গোলাপ গাছের দিকে তাকিয়ে হাসছে। আমি হাসির কারণ জানতে চাইলে হিবা উত্তরে বলল, আজ আমার মনে হচ্ছে আমি একজন নতুন মানুষ। আমি বলে রাখি তোমরা আমাকে নিয়ে গর্ব করবে। এরপর সে প্রতিদিনের মতো হিজাব পরে চলে গেল।

শহর ছাড়ার আগে হিবা তার দুই বোন জিহান ও মারয়ামের সঙ্গে দেখা করতে যায়। তার ক্লাসের এক বন্ধুর নোট বুক ফেরত দেয়। বিদায় জানাতে দাদিমার কাছে যায়। তুবাসে সর্বশেষ তাকে যখন দেখা যায়, তখন তার পরনে ছিল বোরকা।

চার ঘণ্টা পর তাকে যখন আফুলায় দেখা যায় তার পরনে ছিল টি-শার্ট আর জিন্সের প্যান্ট। কোমরে বাঁধা ছিল বিস্ফোরকযুক্ত বেল্ট।

লক্ষবস্তুতে আঘাত হানল সাফল্যের সঙ্গে। সারা পৃথিবীর মানুষ তখন তাকে জানতে পারল ৩২ মাস আগে ফিলিস্তিনের ইনতিফাদা বা গণঅভ্যুত্থান শুরু হওয়ার পর এই নিয়ে পাঁচজন ফিলিস্তিনি নারী শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করতে আত্মঘাতী হামলা চালায়।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে হিবা একজন সন্ত্রাসী হলেও তার পরিবার এবং বিশ্বের মুসলিম নারীদের কাছে তিনি গর্বের ধন। তবে তারা এও জানিয়েছে যে, হিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে আমরা ঘুণাক্ষরেও টের পাই নি। কিছুই জানতাম না আমরা।

হিবা ছিল একজন ধর্মপ্রাণ নারী। হিবার মা জানান ১৫ বছর থেকেই সে বোরকা পরতে শুরু করে। দাদিমা এসব ছেড়ে দিতে বললেও কান দেয় নি তার কথায়। পাঁচওয়াক্ত নামায তো পড়তোই। অবসর পেলেই কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল হয়ে যেত। তুখোর মেধাবী ছাত্রী হিবা সাম্প্রতিক পরীক্ষাগুলোতে অসম্ভব ভালো ফল করেছে।

কেন বা কিসের তাগিদে হিবার মতো একজন ধর্মপ্রাণ ও মেধাবী মেয়ে এমন একটি ধ্বংসাত্মক কাজ করেছে তা ভাবিয়ে তোলে অনেককে। আসলে এমন একটি নিপীড়নমূলক রাজনৈতিক পরিবেশে হিবা বড় হয়েছে যেখানে সর্বদা ইসরাইলি পাষণ্ডরা বুলেট দিয়ে নিরস্ত্র নারী-শিশু নির্বিশেষ সকলকে গণহারে হত্যা করছে। প্রতিদিন তাদের ইজ্জত-সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হচ্ছে। হিবা এসব দৃশ্য বহুবার দেখেছে। এসব বিভৎস দৃশ্য হিবাকে এমন দুঃসাহসিক পথে অগ্রসর হতে প্রেরণা যুগিয়েছে। জাজিরাতুল আরবের ভীরু কাপুরুষ শেখদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, তোমরা বিলাসবহুল বালাখানায় লম্বা লম্বা জুব্বা পরে বসে থাক। ঈমান ও আযাদির ময়দানে আমরা লাখও হিবা জীবন দিয়ে যাব।

হিবা, তুমি অমর! তুমি বিজয়িনী। তুমি জালিমদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার উদাহরণ। তুমি নারীজাতির অহঙ্কার। তুমি আমাদের জেগে ওঠার প্রেরণার উৎস।

একজন নারী মুক্তিযোদ্ধার অমর কাহিনী

ভূস্বর্গ কাশ্মির। গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগরের পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামের নাম সেতাকা। পাহাড় সংলগ্ন গ্রামটির সত্যিই মনকাড়া দৃশ্য। রৌশনী সে গ্রামেরই একটি ছোট্ট পরিবারের মেয়ে। মা-বাবার একমাত্র সন্তান। তাই আদর করে সবাই তাকে রুশি বলে ডাকে। গ্রামের স্কুল পেরিয়ে ১৬/১৭ বছরের তরুণী রুশি ৬ মাইল দূরত্বে রাজধানীর সরকারি কলেজে ভর্তি হয়েছে।

১৯৮৯ সাল থেকে কাশ্মিরের মুক্তিকামী তরুণেরা মুজাহিদ বাহিনী গঠন করে ভারতের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বর্বর বাহিনীর বিরুদ্ধে এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ফলে দেশের অনেক তরুণ-যুবক তাদের সকল কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে সরাসরি ট্রেনিংক্যাম্পে এসে অস্ত্র কাঁধে ভারতীয় হায়েনাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই ভারতীয় সেনারা মুসলিম তরুণদের গ্রেফতারের জন্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চষে বেড়াতে শুরু করে। হঠাৎ হানা দিয়ে নির্বিচারে তরুণদের গ্রেফতারের মহড়া চালাতে থাকে।

১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাস। শ্রীনগর সরকারি কলেজে হানা দিল ভারতীয় সেনাদল। কয়েকজন যুবককে সঙ্গে-সঙ্গে গ্রেফতার করে গাড়িতে তুলে নিল। ইত্যবসরে একজন নরপিশাচের নজর পড়ল বোরকা পরিহিত সুন্দরী রুশির উপর।

অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তারা রুশিকেও সেনাক্যাম্পে নিয়ে এল। শহরের কিছুটা বাইরে সেনাছাউনি। রাতের বেলা পাশবিক নির্যাতনের মানসে সেনা ছাউনির খানিকটা দূরে একটি তালাবদ্ধ গুদাম ঘরে রুশিকে আটকে রাখল। বন্দী মুসলিম তরুণদের সঙ্গে হানাদারবাহিনী কী আচরণ করছে রুশি তা জানে না। তবে বন্দিনী রুশি এতটুকু অবশ্যই জানে যারাই পাষণ্ড ভারতীয় সেনাদের হাতে পড়ে এ-পৃথিবীর আলোছায়া থেকে তারা চলে যায় বহু দূরে। মৃত্যু তাদের অবধারিত। রুশিও নিজের মৃত্যু অবধারিত জেনে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। কিন্তু সে যে নারী? পাষণ্ডরা এত সহজেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে? এতো তাদের ধর্মের পরিপন্থী। নারী মানেই ভোগের সামগ্রী। এটাই তো তাদের ধর্মনীতি। তাই রুশিও মৃত্যুর পূর্বের নির্যাতনের কথা ভেবে তিলে-তিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে বন্দিখানায়। বান্ধবী সীতারানি অবশ্যই মা-বাবার কাছে অপহরণের সংবাদ পৌঁছাবে।

ধীরে-ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। রুশির মন দুরু-দুরু করে কাঁপছে এক

অজানা শঙ্কায়। নিজের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আত্মহত্যার চেয়ে উত্তম পদ্ধতি রুশির জানা ছিল না। গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ফ্যানের সঙ্গে ফাঁসি দিবে। ঠিক এই মুহূর্তেই দরজা খুলে প্রবেশ করল ভারতীয় সেনা অফিসার। বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ শুরু করল সে রুশিকে। রুশিকে ফাঁসি থেকে মুক্ত করল সে। এত সহজে মরতে দিবে কেন? তারপর শুরু হল নির্যাতন। এভাবে পর-পর কয়েকজন সেনা অফিসারের নির্যাতনে মধ্যরাতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে মুসলিমকন্যা রুশি। শেষ পর্যন্ত সেনা-অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেলেও পুনরায় নির্যাতনের লক্ষে রুশিকে হত্যা না করে গুদামে তালা লাগিয়ে পাষণ্ডরা চলে যায়। দীর্ঘক্ষণ অচেতন থাকার পর ফজরের আযানের সুর কানে পৌঁছুতেই চেতনা ফিরে পেল রুশি। নিজের অবস্থার কথা মনে পড়ল তার। হায়েনাদের নির্যাতনের পুরো চিত্র ভেসে উঠল রুশির সামনে। নিজের উপর নিজেই ধিক্কার দিতে শুরু করল সে। হায়! একি হল? ছি, এ জীবন রেখে আর কি লাভ? আত্মহত্যাই তো ভালো ছিল। কেন তা পারলাম না। এখন তাই করে ছাড়ব। এই কলঙ্কিত মুখ জনসমাজে কিভাবে দেখাব? না, আত্মহত্যাই করব। এই ভেবে হারানো ওড়নাটি খুঁজতে লাগল রুশি। অবসন্ন দেহে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। দক্ষিণ জানালা খোলা ছিল। খোলা জানালা দিয়ে মৃদু হাওয়া এসে রুশির মন-মগজ চাঙ্গা করতে লাগল। এবার তার মনে আত্মহত্যার পরিবর্তে নব চেতনার উদ্রেক হল। শিরায় শিরায় এক নতুন অনুভূতির অস্তিত্ব খুঁজে পেল রুশি। ঘৃণা ধীরে ধীরে ক্রোধে পরিণত হতে লাগল।

না, এভাবে মরব না। মৃত্যু যখন হবেই তা হলে আত্মহত্যা কেন? কাপুরুষের মতো মরলে নিজের এবং দশের কি উপকার? মৃত্যু যখন হবেই তবে বীরের মতো মরব। খুন দেব এবং খুন নিব। এক অজানা অনুভূতি শিহরণ খেলে গেল তার দেহমনে।

আমি মুজাহিদ হব, মুজাহিদবাহিনীতে যোগ দিব। একেকটা হায়েনার কাছ থেকে নির্যাতনের কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব নিতে হবে। কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? আমি তো বন্দিনী। এখান থেকে পালাব কিভাবে?

রুশি নির্যাতিত হয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই তার পরিকল্পনা পাল্টে গেল। মুজাহিদ হয়ে মৃত্যুবরণ করার তামান্না সত্যিই তার পথ খুলে দিল।

মানুষ আল্লাহর প্রতি এক পা এগোলে আল্লাহ তাআলা তার গতি দশ কদম এগিয়ে দেন। বুশির বেলায়ও তাই ঘটল। ভীরুর মতো এভাবে অলস পড়ে থাকলে চলবে না। জীবন একটাই। দেশ ও জাতির জন্য কিছু করতে চাইলে এটাই তার শ্রেষ্ঠ সময়।

শোয়া থেকে উঠতে চেষ্টা করল বুশি। কিন্তু পারল না। অবর্ণনীয় নির্যাতনে শরীর নিস্তেজ হয়ে আছে তার। আবার চেষ্টা করল। এবার সে সফল। উঠে দাঁড়াল। দরজা-জানালায় কোনো ফাঁক-ফোকর আবিষ্কার করতে চেষ্টা করল বুশি। একে একে সব কটি দরজা জানালা পরীক্ষা করেছে। হ্যাঁ, পাওয়া গেছে। একটি জানালার শিক অনেকটা বাঁকা হয়ে আছে। আস্তে করে শিকটি সরিয়ে ফেলল। তারপর ধীরে ধীরে বাইরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল বুশি। জন-মানবশূন্য ভোরে আঁধারে শুধু পাহাড়ের পর পাহাড় দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। সেনা ছাউনি এই জানালার বিপরীত দিকে অবস্থিত। তাই এখান থেকে দেখা যায় না। এই তো সুযোগ। সন্তর্পণে বাঁকা শিকটা আর একটু সরিয়ে পা দুটো বাইরে দিয়ে অবসন্ন শরীরটা এলিয়ে দিল। বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কিন্তু এখন যাবে কোথায়? যেখানেই হোক যেতে তাকে হবেই। তাই অজানা পথে দৌড়াতে লাগল বুশি। কিছুক্ষণ দৌড়ানোর পর অনুভব করল পা দুটো অবস হয়ে আসছে। একসময় ক্লান্ত হয়ে পাহাড়ের ঢালুতে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ক্লান্তিভাব কাটিয়ে আবার দৌড়। এভাবে দুইকিলোমিটার গেল। চারদিকে দৃষ্টি বুলালো সে। না, কোথাও কোনো বাড়ি-ঘরের আলামত নেই। হ্যাঁ, বহুদূরে একটা গাছের তৈরী চালামত চোখে পড়ছে।

কিন্তু সে পর্যন্ত পৌছুবে কিভাবে? ক্লান্ত অবসন্ন দেহ ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আসছে। কিন্তু তাকে যে যেতেই হবে। বসে থাকলে হবে কিভাবে? আবার দৌড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল বুশি। কিন্তু পারল না। আবার বসে পড়ল পাহাড়ের ঢালুতে। পূর্বাকাশ অনেক ফর্সা হয়ে এসেছে। আতঙ্কিত অবস্থায় কাটল কিছুক্ষণ। না-জানি হায়েনারা পিছন থেকে এসে ধরে ফেলে। আবার মনে একটু সাহস সঞ্চয় করে চলতে লাগল সে। এভাবে ধীরে ধীরে চলতে চলতে একসময় কুঁড়ে ঘরটির কাছে পৌছল। নীরব নিথর কুড়ে ঘর। চারদিকে পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি বুলাতে লাগল। গাছগাছালিতে ঢাকা এই কুঁড়ে ঘর হতে হঠাৎ আওয়াজ এল– সাবধান! আর এক কদমও এগুবে না। থমকে দাঁড়ায় বুশি। দম বন্ধ হয়ে আসছে। তা হলে কি নির্যাতনের মুখ থেকে মুক্ত হয়ে বন্দুকের

নলের মাথায় এসে পড়লাম? বুশির আতঙ্কিত মনে ভাবনার উদয় হল। আল্লাহ তুমি কোথায়? এক অদৃশ্য আওয়াজ বুশির মনে ধাক্কা দিল। বুশি বলে উঠল, আমি এক নির্যাতিতা মেয়ে। তোমরা কারা?

কুঁড়ে ঘরের ভিতর হতে আওয়াজ এল, আমরা মুজাহিদ।

এবার মুজাহিদগণ প্রশ্ন করল, তুমি কে? এখানে কেন?

বুশি এই প্রশ্নের তাৎক্ষণিক কোনো উত্তর দিল না। ঘুরে দরজার মুখে গিয়ে দেখল কয়েকজন মুজাহিদ ঘুমিয়ে আছে, পাহাড়ের ঢালুর এই নীরব কুঁড়ে ঘরে। বুশি এখন নিশ্চিন্ত হল, সে সঠিক জায়গায়ই এসে পৌছেছে। তাই পাহারাদার মুজাহিদকে সে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। পাহারাদার বুশিকে পাহাড়ের গহীন অঞ্চলে মুজাহিদ ঘাঁটিতে পৌছিয়ে দিল। মুজাহিদ কমান্ডার সবকিছু জেনে নিলেন।

কমান্ডার বুশির করুণ কাহিনীতে স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। এরপর মুজাহিদ কমান্ডার প্রথমে বুশির চিকিৎসা ও তারপর ট্রেনিঙের ব্যবস্থা করলেন। সাতদিন প্রাথমিক ট্রেনিঙের পর বুশিকে আরও তিন মাইল গভীর অরণ্যের ট্রেনিং ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হল। সেখানে পৌছে আর কজন মহিলা যোদ্ধার সাক্ষাৎ পেল বুশি। সকলের একমাসের ট্রেনিং শেষ হল। এই ট্রেনিংগুলোতে বিশেষ করে ছয়জন মহিলাকে গেরিলা প্রশিক্ষণসহ বোমা হামলা, অতর্কিত হামলা, মাইন পোঁতা এবং আগ্নেয়াস্ত্রের ট্রেনিং দেওয়া হল।

একমাস ট্রেনিং শেষে প্রত্যেক মহিলা মুজাহিদকে বিভিন্ন সেক্টরে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রেরণ করা হল। বুশিকে প্রেরণ করা হল একটি অপরিচিত এলাকায়।

বুশির কর্মস্থল দেওয়া হয়েছে রাজধানী শ্রীনগরে। শ্রীনগরে পৌছে বুশি আর বুশি নেই। সে এখন এক প্যান্ট-শার্ট পরিহিত হিন্দু তরুণী। নিয়তি রানি সাহা। যেখানেই যায় নিয়তি রানি সাহা পরিচয় দেওয়ায় সাতখুন মাফ হয়ে যাচ্ছে। কারো সন্দেহ নেই তার প্রতি। রাত যাপনের জন্য জনৈক হিন্দু মেয়ে আরতি সাহার সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিল নিয়তি রানি। আরতির বাসায়ই অবস্থান করল সে। আরতি-পরিবারের সবাই জানে নিয়তি রানি চাকুরির খোঁজে শহরে এসেছে। তাই সকালে ঘর হতে বের হয়ে আবার রাতে ফিরে আসে। দিনভর চাকুরির সন্ধান করে। এক দুইদিন পরই নিয়তি রানির মোক্ষম সুযোগ এসে গেল। স্থানীয় গ্রেট হলে পাঁচ হাজার লোকের অবস্থান। নাচ, গান ও নাটক

হবে। গোয়েন্দা মুজাহিদ আবদুল্লাহ সরকারের সরবরাহকৃত শক্তিশালী বোমার বাক্স হতে একটিমাত্র বোমা নিয়ে নিয়তি রানি সাহা উক্ত হলে ঢুকে পড়লেন দর্শক হয়ে।

শুরুতেই জমে উঠল নাচ-গানের আসর। নাচের তালে তালে শ্রোতাদের হৈ-হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে পিছন থেকে কি যেন উড়ে এল স্টেজে। ধপাস করে পড়েই বিকট শব্দ। মুহূর্তেই সবকিছু উলট-পালট হয়ে গেল। যে যেদিকে পারল ছুটল। হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে কে কার আগে বেরুবে সেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। ধাক্কাধাক্কিতে বহুলোক আহত হল।

বোমা বিস্ফোরণে আগুন ধরে গেল। ততক্ষণে নিয়তি বান্ধবী আরতির বাসায় সহি-সালামতে পৌঁছে গেল। এদিকে গ্রেট হলের চারপাশে পুলিশ ভরে গেল। দমকলবাহিনী আগুন আয়ত্তে আনতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

হতাহতদের হাসপাতালে নেওয়ার জন্য অনেকগুলো অ্যাম্বুলেন্স হলের সদর গেটে এসে দাঁড়িয়ে গেল। পুলিশ গোটা এলাকা ঘিরে নিল। গ্রেট হলে অসংখ্য মুজাহিদ ঢুকেছে, এ-কথা সকলের মুখে মুখে। সন্দেহভাজন ৪০ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এর মধ্যে অনেক নিরপরাধ মুসলিম যুবকও রয়েছে। কয়েকজন হিন্দু যুবক তাদের হিন্দু নাম বলার পরও পুলিশ তাদের ছাড়ে নি। পুলিশ বলছে, 'বাঁচার জন্য হিন্দু সেজেছ। দাঁড়াও মজা দেখবে।'

কয়েক ঘন্টা পর দমকলবাহিনী আগুন আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়। গ্রেট হলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিশ লক্ষ রুপি। আর ৯০ জন হিন্দু তরুণ-তরুণী নিহত হয়। আহত হয় আরো ৬/৭ গুণ। শ্রীনগরের বড় হাসপাতালে আহতদের ঠাঁই হল না। গভীর রাতে নিয়তি রানি সাহা ঘুম থেকে উঠে অজু সেরে দুই রাকাত শোকরানা নামায আদায় করল। গোয়েন্দা মুজাহিদ আবদুল্লাহ সরকার নিয়তি রানি সাহার দুঃসাহসিক সফল অভিযানের সংবাদ মুজাহিদ হেড অফিসে পৌঁছে দিল।

পরদিন বিধ্বস্ত গ্রেট হলে পরিদর্শনে এল স্থানীয় পৌরপ্রশাসক। সঙ্গে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা। সেখানে নিয়তি রানির আগমন হাজারো জনতার মাঝে। পকেটে আবদুল্লাহ সরকারের সরবরাহকৃত বোমা। সবাই হলের ক্ষয়ক্ষতির করুণ চিত্র ঘুরে ঘুরে দেখছে। হঠাৎ এক দিক থেকে বিকট আওয়াজ। আবার বোমা বিস্ফোরণ। সবাই দেখল বারান্দায় এক সেনা অফিসারসহ ৫ সেনা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়ে আছে। নিয়তি রানি আগত শত শত

মহিলার সঙ্গে মিশে গেল। কয়েকজন হিন্দু যুবককে মুজাহিদ সন্দেহে গ্রেফতার করল পুলিশ। কোথাও কোনো মুজাহিদের লেশমাত্র পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত জনতাকে সরিয়ে দেওয়া হল। আহতদের মধ্যে একজন মাত্র বেঁচে গেল পঙ্গু হয়ে। বাকি সকলের মৃত্যু হল। বাসায় ফিরে নিয়তি রানি তার বাবাকে চিঠি লিখল তার মুজাহিদ জীবনের সংবাদ জানিয়ে। এটাই যে নিয়তির শেষ চিঠি হবে কে জানত?

তার তিনদিন পরের ঘটনা। নিয়তি রানি পাকা সড়কের উপর দিয়ে আনমনে হাঁটছে। হঠাৎ সামনের দিক থেকে সেনাবাহিনীর জিপ এসে পড়ল। জিপের সেনারাই বুশি নামের নিয়তিকে কলেজ থেকে তুলে এনে রাতভর নির্যাতন করেছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে নিয়তি হঠাৎ করে উপর্যুপরি তিনটি বোমা মারল গাড়ির সামনে মধ্যখানে। অফিসারসহ পাঁচজন সঙ্গে সঙ্গেই নিহত হল। সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। সামনের দিক থেকে আসা সেনাবাহিনীর ট্যাংকের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল নিয়তির বুক। চিরদিনের মতো লুটিয়ে পড়ল নিয়তি। সেনারা দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখে একেবারে হতবাক। আরে, এ তো সেই কলেজছাত্রী, যাকে আমরা ২ মাস পূর্বে কলেজ থেকে তুলে এনেছিলাম। আজ সে আমাদের পাঁচজন সেনা অফিসারকে হত্যা করল। সে তো তার নির্যাতনের প্রতিশোধ কড়ায়গণ্ডায় নিয়েছে। সেনারা বুশির প্যান্টের পকেট থেকে পাওয়া ডায়েরি থেকে জানতে পারল তার গ্রেট হলে আক্রমণের বিস্তারিত সংবাদ। এমনকি তার পরিবর্তিত নাম নিয়তি রানি সাহা।

এদিকে হিন্দু বান্ধবী খুঁজতে লাগল নিয়তি রানিকে। কয়েকস্থানে টেলিফোন করেও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। পরদিন সকল দৈনিক পত্রিকায় প্রধান শিরোনাম হয়ে এল মুজাহিদ নেত্রী নিয়তি রানি সাহা নিহত। পত্রিকার সংবাদ দেখে অবাক হল আরতি। নিয়তি নিহত! সে মুজাহিদ নেত্রী। সে মুসলিম! পত্রিকার বিস্তারিত বিবরণ জেনে আরতি ভাবল সরকারি কলেজের সেই বুশি ভারতীয় সেনাদের হাতে রাতভর নির্যাতিত হয়ে প্রতিশোধের নিদারুণ স্পৃহায় মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিয়ে নিয়তি রানি নাম ধারণ করেই আমার বান্ধবী সেজেছিল। আর একের পর এক হত্যা চালিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছিল। মুসলমানরা এত দুঃসাহসী! এত জিদ তাদের। এত সাফল্য!

পুরো শহরে সাড়া পড়ে গেল, মুজাহিদ নেত্রী নিয়তি রানির নিহত হওয়ার সংবাদ। মানুষের এত বলাবলি শুনে বাবা আকবর নিজ হাতে পত্রিকার পাতা খুলে মুজাহিদ নেত্রী নিয়তি রানি সাহার নিহত হওয়ার সংবাদ বিস্তারিত পড়ে বুঝতে পারলেন, এ তার কন্যা বুশি ছাড়া কেউ নয়। কাউকে বলতেও পারলেন না যে, বুশি তার মেয়ে। আবার সামান্য কাঁদতেও পারলেন না নানা ভয়ে। না জানি কেউ জেনে ফেলে আমি মহিলা মুজাহিদ বুশির পিতা।

সরাসরি বাড়ি ফিরে এলেন বাবা আকবর। বাড়িতে পৌঁছেই বুশির লেখা চিঠি পেলেন বাবা। বুশি লিখেছিল।

বাবা!

আমার সশ্রদ্ধ সালাম গ্রহণ করবেন। মাকেও সালাম দিবেন। আমি বুশি আপনাদের একমাত্র সন্তান। কলেজ থেকে ভারতীয় নরখাদকদের হাতে বন্দি হয়ে রাতভর নির্যাতিত হয়েছিলাম তাই তোমাদের মুখ দেখাব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। এই কারণে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারি নি। এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে তা করতে দিল না। মৃত্যু যখন হবেই কাপুরুষের মতো নয়! বীরের মতো মৃত্যুই উত্তম। তাই বহুকষ্টে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিয়ে ট্রেনিং গ্রহণ করে দেশমাতৃকার চিরশত্রু ভারতীয় দখলদারদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। প্রথম অভিযানে ৯০ জন হিন্দু নারী পুরুষ এবং দ্বিতীয় অভিযানে ৪৭ জন নরখাদকে হত্যা করে নির্যাতনের প্রতিশোধ নিলাম।

আপনাদের যদি কোনো সন্তান না হত তাহলে কি আপনারা চিরদিন নিঃসন্তান হয়ে বেঁচে থাকতেন না? আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাদের সন্তান হিসেবে দিয়েছেন কাশ্মিরের এ-মাটি যারা অপবিত্র করছে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য।

আমি মেয়ে তাই বলে আমার জন্য জিহাদ ফরজ নয়? আমার ইজ্জত-আবরু কাশ্মিরের জিহাদে বিলীন করেছি। এখন নিজের প্রাণটুকুও বিলিয়ে দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত আছি। যে কোনো সময় তাও দিয়ে দেব। এই কাশ্মিরের মাটি শত্রুমুক্ত করার জন্য আমি যখনই আমার প্রাণটুকু আল্লাহর রাস্তায় কোরবান করে দিব, তা শুনে আপনারা কাঁদবেন না। শুধু আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করবেন শহীদের পিতা-মাতা হতে পেরেছেন বলে। এরচেয়ে বড় নিয়ামত আর কী হতে পারে আপনাদের জন্য? আমার জন্য দুআ করবেন।

ইতি– আপনাদের বুশি

উম্মাহর প্রতি এক নির্যাতিত নারী

কাশ্মির ভূখণ্ডে ভারতীয় বাহিনীর নির্যাতনের কাহিনী বর্তমান বিশ্বের কাছে কোনো গোপন বিষয় নয়। তবু নির্যাতনের ধারা থেমে নেই। বরং কখনো কখনো তা বিশ্ব বিবেককেও হতবাক করে দেয়। সারা পৃথিবীর নিন্দা আর ধিক্কারের পরোয়া না-করে প্রতিদিন বহু জনপদের শত শত প্রাণ জ্বলছে রাজনৈতিক জিঘাংসার আগুনে। এখানে একজন নির্যাতিত কাশ্মিরী বোনের চিঠি পড়েই আমরা উপলব্ধি করব এদের নৃশংসতার চিত্র।

'আমি নিশ্চয় হাওয়া আলাইহিস সালামের কন্যা। ভূস্বর্গ কাশ্মির উপত্যকার রাজধানী শ্রীনগর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে আমার বাড়ি। আমি ছাড়া আমার স্বামী আবদুর রশীদ ও আমার ছোট একটি ছেলে খালেদ রশীদ। এ তিনজন নিয়েই ছিল আমার সাজানো সংসার। আমাদের বাড়ির চতুর্দিকে ছিল কাশ্মিরী আঙুর-আপেলে ঘেরা। সবুজ নয়নাভিরাম নৈসর্গিক সৌন্দর্যের প্রাচুর্য ছিল সারা এলাকাজুড়ে।

হে মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! আমার মতো হাজারো নির্যাতিত বোন আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আপনাদের একান্ত সহযোগিতা কামনা করছে। আল্লাহ না করুন, এমন যদি আপনাদের হাজারো বোনের হয়, তাহলে আপনাদের অলস নিঁদ ভাঙবে কবে? চেতনা জাগবে কবে?

আল্লাহর কসম, নিজেদের শত মতভেদ পিছনে ফেলে ঐক্যবদ্ধ হোন, জেগে উঠুন। সিংহ-শাবকদের ভীরু শৃগালের মতো কাপুরুষোচিত জীবন-যাপন শোভা পায় না। জালিম ব্রাহ্মণ্যবাদের ভণ্ডামির আড্ডায় মুহাম্মাদ বিন কাসিমের মতো কুঠারাঘাত হানুন। এখনো সময় আছে আপনার মুসলিম বোনদের ইজ্জত রক্ষা করুন। এ দুর্যোগেও যদি আপনার ঘুম না ভাঙে, আপনার পৌরুষের ধমনীতে আগুন না লাগে, ব্যাঘ্র হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে না আসতে পারেন, তাহলে আপনাদের এ অসচেতনতা মনের দিবানিদ্রা কোনো দিন ভাঙবে না। বোধোদয় ঘটবে না কোনোদিন। হে মুসলিম বিশ্বের শেরদিল ভ্রাতৃগণ, আপনাদের এক নির্যাতিত ভাগ্যাহত বোনের নির্মম কাহিনী আপনাদের নিকট বিধৃত করছি।

১৯৯৩ এর ১৫ জুলাই। আমি আমার কলিজার টুকরা খালেদকে কোলে নিয়ে উঠোনে বসেছিলাম। আমার স্বামী আবদুর রশীদ বৈঠকখানায় তার এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করছিলেন। গোলাম মুহিউদ্দীন নামের উক্ত বন্ধু আমার

স্বামীর বাল্যবন্ধু। সে যে এখন একজন প্রশিক্ষিত কমান্ডো তা আমার জানা ছিল না। পুরো এক বছর গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়ে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসে আমার স্বামী আবদুর রশীদকে জিহাদি প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা শোনাচ্ছিল। এমন সময় কে যেন বাড়িতে এসে দরজায় কড়া নাড়লো। আবদুর রশীদ দরজা খুলে দিলে আমার ছোট ভাই ঘরে প্রবেশ করে কুশল বিনিময়ের পর খালেদকে কোলে নিয়ে সোহাগ করতে লাগল। খালেদও মামার কোলে খেলতে লাগল।

মাগরিবের নামাযান্তে আমার স্বামী এবং গোলাম মুহিউদ্দীন বৈঠকখানায় অনেক রাত পর্যন্ত আলাপ করে এশার নামায পড়ে সেখানেই রাতের খাবার খেলেন। অধিক রাতে শুলেও সবাই আযানের অনেক আগেই উঠে ফজরের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমিও অযু করে মাত্র আল্লাহর দরবারে সেজদা দিচ্ছি, এমন সময় পাশের বাড়ি থেকে ভেসে এলো কান্নার রোল। ভারতীয় ফৌজ গ্রাম অবরোধ করে লুট, ধর্ষণ, হত্যা আর অগ্নিসংযোগে পুরো গ্রামে এক নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। কয়েক শ বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে, ২০ জন নারীর শ্লীলতাহানী করে এবং ৩০ জনকে হত্যা করার পর যখন আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করল তখনই তাদের উন্মাদনায় বাঁধা পড়ল। আমার দিকে হাত বাড়াতেই দেখতে দেখতে চারজন ভারতীয় সেনা মাটিতে গড়াতে লাগল। কিছুক্ষণ তড়পানোর পর তারা চিরতরে ঘুমের কোলে লুটিয়ে পড়ল।

এটা হল গোলাম মুহিউদ্দীনের প্রথম টার্গেট। পুরো কাহিনী শেষ হয় নি এখনও। আমার স্বামীর হাতে ছিল পিস্তল। আর ভাই আবদুল হামীদ ক্লাশিনে ম্যাগজিন ভরে দিচ্ছিল। গোলাম মুহিউদ্দীনের প্রতিটি নিশানা টার্গেটে পৌছতে লাগল। তার অব্যর্থ নিশানায় ভারতীয় হায়েনা একের পর এক ধরাশায়ী হচ্ছিল।

আমি তখন খালেদকে বুকে জড়িয়ে ধরে ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ একটি গুলি এসে আবদুল হামীদের মাথা এঁফোড়ওঁফোড় করে দিল। মুহূর্তেই শাহাদাতের অমিয় সুধা পানে ধন্য হল সে। এরপর ভারতীয় সেনারা শুরু করলো এলোপাথাড়ি গোলাবর্ষণ। স্বামী আবদুর রশীদের পিস্তল স্তিমিত হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। চিরদিনের জন্য সে আমাদের ছেড়ে জান্নাতবাসী হয়ে গেল। গোলাম মুহিউদ্দীন খালেদকে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে আমাকে চলে যেতে বলল। কিন্তু আমার পা এক কদমও সরাতে

পারছিলাম না। এমন সময় দশ বারোজন ভারতীয় সেনা আমার ঘরে ঢুকে গোলাম মুহিউদ্দীনের বুকে বুলেটের আঘাত হানলে আমার চোখের সামনেই বিদায় হয়ে গেল সবাই। আমার কোল থেকে খালেদকে ছিনিয়ে নিয়ে বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা করে ফেলল ভারতীয় হায়েনারা। আমার ঘরের সব মাল-সামানা লুট করে নিল তারা। আমার চোখে নেমে এল ঘোর অন্ধকার। এবার আমার পালা। ইজ্জত রক্ষার্থে প্রাণপণ চেষ্টা করলাম। কিন্তু চারটি হিংস্র জানোয়ার এক সঙ্গে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

প্রাণপ্রিয় মুসলিম ভাই-বোনেরা! এরপর যা হবার তাই হল। শুনলে আপনাদের জাতীয় চেতনায় আঘাত লাগবে। ভিজে যাবে চোখের পাতা। কাশ্মিরের হাজারো বিষণ্ন অসহায় বোন আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। যদি আপনাদের সাহস না থাকে, যদি আপনাদের মধ্যে সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর অভাব হয়, মুহাম্মাদ বিন কাসিমের দীপ্ত তেজ জমে গিয়ে থাকে, যদি আপনারা কাপুরুষ হয়ে থাকেন? তাহলে আমাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিন আমরা আমাদের ইজ্জত রক্ষা করব।

এতোমাত্র একজন মুসলিম বোনের ব্যথিত হৃদয়ের আর্তনাদ ধ্বনি। এমন হাজারো কাশ্মিরী বোন আজ লাঞ্ছিত, নির্যাতিত। ভারতীয় বাহিনীর ধর্ষণ, হত্যা, নির্যাতনে কাশ্মিরী সন্তানহারা মা, স্বামীহারা বিধবা বোন, আর নিপীড়িত অসহায় রমণীর ফরিয়াদে কাশ্মিরের বাতাস ভারী হয়ে গেছে। তারা আজ খাদ্য চায় না, বস্ত্র চায় না, চায় অস্ত্র। নিজেদের ইজ্জত বাঁচাতে ওদের সাহায্য দরকার।'

এ-আর্তনাদ আমাদের মনে কোনো প্রভাব ফেলবে কি?

একজন বীরদীপ্ত নারী

এস হে নবীন, এস আল্লাহর পথে। এস, আল্লাহ তোমাদের জান্নাতের দিকে ডাকছেন।

এ এক বৃদ্ধা বীর নারীর আহ্বান। একজন মুসলমান বৃদ্ধা শহরের বাজারে গিয়ে উঁচু আর গুরুগম্ভীর স্বরে লোকজনকে জিহাদের প্রতি আহ্বান জানাত।

মোগল সাম্রাজ্যের শেষ সময়। জায়গায় জায়গায় ইংরেজ বাহিনী ঘাঁটি গেড়ে জেঁকে বসেছে মুসলমানদের উপর। দফায় দফায় আক্রমণ করে মুসলমানদের ঐক্যকে মিসমার করতে লাগল তারা। সম্মিলিতভাবে

ইংরেজদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কেউ আর অবশিষ্ট রইল না। চোখ বুজে কাফেরগোষ্ঠীর আক্রমণ সহ্য করতে লাগল নিরীহ মুসলমান। সে সময় ইংরেজ তাদের ঘাঁটির জন্য বেছে নিয়েছিল বিভিন্ন টিলা ও পাহাড়। সেখান থেকে কাশ্মিরের দিক থেকে দিল্লি পর্যন্ত নির্বিচারে গুলি চালাত তারা। সে সময় সবুজ পোশাকধারী একজন বৃদ্ধা নারী উল্লিখিত আওয়াজে শহরবাসীদের একত্রিত করত। শহরবাসীরা এই ডাক শুনে চারদিকে জড়ো হত। আর তাদের সবাইকে নিয়ে তিনি কাশ্মিরী গেটের উপর আক্রমণ করতেন। এভাবে শহরবাসীদের সঙ্গে নিয়ে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আক্রমণ চালাতেন।

সেই নারী মুজাহিদ ছিলেন অসম সাহসী, নির্ভীক। মৃত্যুভয় তাঁর মোটেই ছিল না। গোলাবৃষ্টির মধ্যে তিনি বাহাদুর সিপাহির মতো এগিয়ে যেতেন। কখনো পদাতিক, কখনোবা অশ্বারোহিনী। বন্দুক, তলোয়ার ও একটি পতাকা থাকত তাঁর নিকট সর্বদা। খুব দক্ষতার সঙ্গে বন্দুক চালনা করতেন তিনি। অনেকবার দেখা গেছে তিনি সৈনিকদের সঙ্গে মুখোমুখি তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করছেন।

সেই নারীর বীরত্ব ও নির্ভীকতা দেখে শহরের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে পড়ত এবং এগিয়ে গিয়ে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ত। যেহেতু যুদ্ধের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। তাই প্রায়ই রণাঙ্গন হতে তারা পলায়ন করত। পরে বাধ্য হয়ে তাঁকেও ফিরে আসতে হত। কেউ জানতো না সে কোথায় যায় আর কোথা হতে আসে।

এভাবে একদিন এমন হল যে, সে উত্তেজনা ও উন্মাদনায় আক্রমণ চালাতে চালাতে, বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে ও তলোয়ার চালাতে চালাতে ঘাঁটি পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এবং ঘোড়া হতে পড়ে গেলেন। ইংরেজ বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে ফেলল। তারপর কেউ জানে না তাঁকে কোথায় নেওয়া হয় এবং তাঁর পরিণতি কী হয়েছিল?

দিল্লির প্রাদেশিক সরকার কিছু ইংরেজি পত্র প্রকাশ করেছে যা দিল্লি ঘেরাও করার সময় ইংরেজ সামরিক অফিসারেরা লিখেছিল। এসব চিঠিপত্রের মধ্যে একটি চিঠি লেফটেন্যান্ট ডবলু এস আর হাডসনের, যা তিনি দিল্লি ক্যাম্প থেকে ২৯ জুলাই ১৮৫৭ তারিখে মিস্টার জে. গিলসন ফরসাই, ডেপুটি কমিশনার আম্বালাকে পাঠিয়েছিলেন। এই পত্রের মধ্যে ওই মুসলিম বৃদ্ধার

বিষয়ে কিছু তথ্য দেওয়া আছে। পত্রের মন্তব্য এই ধরনের-

'মাই ডিয়ার ফরসাই, তোমার কাছে একজন মুসলমান বৃদ্ধা পাঠাচ্ছি। অদ্ভুত ধরনের এক নারী। সবুজ রঙের পোশাক পরে জনসাধারণকে বিদ্রোহ করার জন্য উত্তেজিত করত। আর নিজেই হাতিয়ার নিয়ে তাদের নেতৃত্ব দিয়ে ঘাঁটির উপর আক্রমণ করত। যেসব সৈনিকের সঙ্গে ওর মোকাবেলা হয়েছে তারা বলে যে, সে বহুবার সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে আক্রমণ করে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে হাতিয়ার চালায়। আর ওর শক্তি পাঁচটি পুরুষের সমান।

যেদিন তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, সেদিন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সে শহরের বিদ্রোহীদের সৈনিক কায়দায় লড়াচ্ছিল। তাঁর বন্দুক দিয়ে সে অনেককে হত্যা করেছে। অবশেষে তাঁর সঙ্গীরা সব পালিয়ে যায়। আর সে আহত অবস্থায় গ্রেফতার হয়। জেনারেলের সামনে পেশ করা হলে তিনি তাকে নারী ভেবে মুক্ত করে দেওয়ার আদেশ জারি করেন। কিন্তু আমি তাকে নিরস্ত করি। বলি, যদি একে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে শহরে ফিরে গিয়ে নিজের দৈবশক্তির ব্যাপারে ঘোষণা করবে এবং অন্ধ বিশ্বাসের বেড়াজালে বাঁধা লোকেরা এর মুক্তি কোনো দৈবশক্তির পরিণাম বলে মেনে নেবে। হতে পারে ছাড়া পাওয়ার দরুণ এই নারী ফ্রান্সের সেই বিখ্যাত নারীর মতো আমাদের জন্য জটিল সমস্যার সৃষ্টি করবে। ফরাসি বিদ্রোহের ইতিহাসে যার উল্লেখ আছে। [ফ্রান্সে বিদ্রোহের সময় জোয়ন অব আর্ক নাম্নী এক নারী এভাবেই শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করত। হাজার হাজার লোক তাকে দৈবশক্তির প্রতীক মেনে নিয়ে তার পক্ষ নেওয়ায় ভীষণ যুদ্ধ ও রক্তপাত হয়। জনসাধারণ ভাবত এই নারী কখনো মরবে না। অবশেষে ফ্রান্সের বিরোধী দলের সেনারা তাকে জীবন্ত দগ্ধ করে। তবেই উপদ্রব শান্ত হয়। সেই নারীর সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে পত্রের মধ্যে।]

'জেনারেল আমার কথা মেনে নিলেন এবং মহিলাটিকে বন্দি রাখার আদেশ দিলেন। মহিলাটিকে আপনার নিকট পাঠানো হচ্ছে। আশা করি আপনি একে কয়েদ করে রাখার সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কেননা এই ডাইনি ভীষণ বিপজ্জনক।' হাডসন।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

উম্মতে মুহাম্মাদির শ্রেষ্ঠত্বের কারণ

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা বলে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সে আমার থেকে নিজেকে, তার সম্পদকে রক্ষা করে নিল। তবে ইসলামের হক হলে ভিন্ন কথা, [অর্থাৎ ঈমান আনয়নের পরও যদি কেউ এমন কোনো অন্যায় করে ফেলে, ইসলামী আইনে যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, তাহলে এক্ষেত্রে তাকে যথাযথ শাস্তিভোগ করতে হবে। মুসলমান হওয়ার কারণে সে এই শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না।] তার হিসাব পরাক্রমশালী প্রভুর জিম্মায়। –সহীহ বুখারী, ২৯৪৬

এই হাদীসটি মুসলিম শরীফে এভাবে এসেছে–

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوْا عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ. (مسلم ١٣٨)

এ-হাদীস দ্বারা জানা গেল, জিহাদ আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত একটি বিধান। আর এই বিধান ততক্ষণ পর্যন্ত বহাল থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এক আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি না দেয়। অর্থাৎ যতক্ষণ না মানুষ কালেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে যাবে কিংবা কালেমায় বিশ্বাসীদের আনুগত্য মেনে নেবে।

এ-হাদীস দ্বারা এও বোঝা গেল যে, মুসলমানের কালেমাওয়ারী দাওয়াতের পিছনে সামরিক শক্তি কার্যকর। অর্থাৎ মুসলমান যাকেই কালেমার, ঈমানের দাওয়াত করবে, সেই দাওয়াতের পিছনে সামরিক শক্তিকেও সঙ্গে রাখতে হবে। কেননা কেউ যদি ঈমানের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং ঈমানদারদের আনুগত্য অস্বীকার করে, তাহলে যুদ্ধের মাধ্যমে তার সমাধান দেওয়া যায়। কারণ এমনটা হতে পারে না যে, মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতেও

অস্বীকার করবে, জিজিয়া দিয়ে মুসলমানদের আনুগত্যে বসবাস করতে রাজি হবে না, তারপরও তারা শান্তিতে, নিরাপদে দেশ শাসন করতে থাকবে এবং মানুষকে ইসলাম হতে দূরে রাখতে সচেষ্ট হবে। এ-কারণেই জিহাদের বিধান দেওয়া হয়েছে। যাতে এরূপ অবাধ্য গোষ্ঠীগুলোকেও শায়েস্তা করা যায়। ইসলামের দাওয়াতও প্রসার লাভ করতে থাকে এবং ইসলামের দাওয়াত কোথাও বাঁধাগ্রস্ত না হয়। সাহাবায়ে কিরাম রাযি. যখনই দুনিয়ার কোনো রাজা-বাদশাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন ও শাসকবর্গকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেছেন, তখন তারা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাক তাঁর আখেরি নবীর দাওয়াতকে এতো দুর্বল করেন নি যে, তোমরা তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলে আমরা নীরবে ফিরে যাব। বিড়ালের মতো লেজ গুটিয়ে ঘরমুখী হব। বরং আল্লাহ পাকের এই জীবনবিধান পৃথিবীর কোণায় কোণায় ছড়িয়ে পড়তে এবং বিজয়ী হওয়ার জন্য নাযিল হয়েছে। কাজেই পথে যতই প্রতিবন্ধকতা আসুক না কেন, আমরা তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রক্তের ফোটায় ঝাণ্ডা উড়িয়ে এই দাওয়াতের মিশন নিয়ে এগিয়ে যাব। এ-মর্মে বুখারী শরীফের একটি হাদীস নিম্নরূপ।

...عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ: فَنَدَبَنَا عُمَرُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ حَتّٰى إِذَا كُنَّا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرٰى فِي أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَقَامَ تَرْجُمَانٌ لَهُ فَقَالَ لِيُكَلِّمْنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ سَلْ عَمَّا شِئْتَ قَالَ: مَا أَنْتُمْ؟ فقَالَ: نَحْنُ أُنَاسٌ مِنْ الْعَرَبِ كُنَّا فِيْ شَقَاءٍ شَدِيدٍ وَبَلَاءٍ شَدِيدٍ، نَمَصُّ الْجِلْدَ وَالنَّوٰى مِنْ الْجُوعِ. وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعْرَ، وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالحَجَرَ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرَضِيْنَ [تَعَالٰى وَجَلَّتْ عَظْمَتُهُ ذِكْرُهُ] إِلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ أَنْفُسِنَا. نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ. فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا [صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتّٰى تَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ. أَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ. وَأَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا. أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلٰى الْجَنَّةِ فِيْ نَعِيمٍ، لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ، وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ...

হযরত জুবায়ের ইবনে হায়্যাহ রহ. বলেন, হযরত উমর রাযি. একবার আমাদেরকে (জিহাদে প্রেরণের জন্য) তলব করলেন এবং নুমান ইবনে মুকার্‌রিন রাযি.-কে আমির নিযুক্ত করলেন। আমরা যখন শত্রু এলাকার কাছাকাছি পৌছলাম, তখন কিসরার গভর্নর চল্লিশ হাজার সেনা নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। উভয় দল মুখোমুখি হলে তাদের প্রতিনিধি এসে বলল, তারা আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। হযরত মুগিরা বিন শো'বা রাযি. বললেন, তোমরা যা জিজ্ঞাসা করার করতে পার। লোকটি বলল, আচ্ছা, তোমরা কারা? মুগিরা রাযি. বললেন, আমরা আরবের অধিবাসী। আমরা কঠিন বিপদাপদে নিমজ্জিত ছিলাম। ক্ষুধার তাড়নায় আমরা পশুর চামড়া, খেজুরের বীচি ইত্যাদি চুষে খেতাম। কাপড়ের অভাবে আমরা লোম ও পশম পরিধান করতাম। আমরা গাছ ও পাথরের পূজা করতাম। এমনি কঠিন পরিস্থিতিতে আসমান-জমিনের প্রভু আমাদের জন্য আমাদের মধ্য থেকেই একজন নবী প্রেরণ করেন। আমরা তার পিতৃ ও মাতৃ পরিচয় জানি। [অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের তিনি।] আমাদের সেই নবী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা তোমাদের সঙ্গে সেই সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করব, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করতে শুরু করবে। অথবা আনুগত্য মেনে জিজিয়া দিয়ে বসবাস করতে রাজি হবে। আমাদের নবী আমাদেরকে এ-কথা বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহর বাণী সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে আমাদের যারা যুদ্ধ করতে করতে নিহত হবে, তারা জান্নাতে এমন সব নিয়ামত লাভ করবে যা পূর্বে সে কখনও দেখে নি। আর যারা বেঁচে থাকবে তারা তোমাদের ঘাড়ের মালিক হবে। [বিজয় অর্জন করে তারা তোমাদের শাসক হবে।] -সহীহ বুখারী, ১/৪৪৭

ইসলামের, ঈমানের দাওয়াতের পিছনে সমরশক্তি কার্যকর থাকা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

অর্থ- 'তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। তোমাদের বের করা হয়েছে মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে

বিরত রাখবে। আর আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।' সূরা-আ-লে ইমরান : ১১০

উম্মতের সর্বাপেক্ষা বড় মুফাস্সির বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এ-হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

تَأْمُرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَيُقِرُّوْا بِمَا اَنْزَلَ اللهُ وَيُقَاتِلُوْنَهُمْ عَلَيْهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اَعْظَمُ الْمَعْرُوْفِ وَالتَّكْذِيْبُ هُوَ اَنْكَرُ الْمُنْكَرِ

অর্থ- তোমরা মানুষকে নির্দেশ দেবে যেন তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা স্বীকার করে এবং এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হল সর্বাপেক্ষা বড় মারুফ (সৎকর্ম) আর আল্লাহকে অস্বীকার করা হচ্ছে সবচাইতে বড় মুনকার (অসৎকর্ম)। –আত্ তাফসীরুল কাবীর ৭/১৮০

প্রশ্ন উঠতে পারে, ঈমান আনয়ন করা, সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজ হতে বিরত রাখা এসব কাজ তো আগেকার উম্মতের মধ্যেও ছিল। অর্থাৎ ওই তিনটি বিষয়কে আলোচ্য আয়াতে উম্মতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ কি? ইমাম কাফফাল রহ. জবাব এভাবে দিয়েছেন-

উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার অন্যান্য উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হল, এ-উম্মত আমর বিল মারুফ, নাহি আনিল মুনকারের সবচেয়ে বড় স্তর তথা জিহাদের আমল করে থাকে। কেননা আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার কখনও অন্তর দ্বারা হয়ে থাকে। কখনও হয় হাত ও জবান দ্বারা। কিন্তু এর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী স্তর কিতাল। কারণ জিহাদে একজন মানুষ তার জীবনকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করে। আর সর্বাপেক্ষা বড় মারুফ হচ্ছে দীনে হক তাওহিদ ও রিসালাতের উপর ঈমান। সবচেয়ে বড় মুনকার হচ্ছে আল্লাহর দীনকে অস্বীকার করা। জিহাদের মাধ্যমে দীনকে সবচাইতে বেশি ক্ষতিকর বস্তু কুফুর থেকে রক্ষা করা হয়। আর শরীয়তে মুহাম্মাদিয়া যখন অন্যান্য শরীয়ত অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন বলে প্রমাণিত হল, কাজেই জিহাদ অন্যসব উম্মতের উপর উম্মতে মুহম্মাদিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসেবে বিবেচিত। –আত্ তাফসীরুল কাবীর, ৮/১৮০

এখানেও প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কিতালও তো পূর্বেকার উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। ইমাম কাফফাল রহ. এর জবাব হল, ছিল বটে; তবে উম্মতে মুহাম্মাদীর ন্যায় এত ব্যাপক ও গুরুত্বের সঙ্গে ছিল না। জিহাদ ও কিতাল এত গুরুত্বপূর্ণ ফরজ বিধান হওয়া শরীয়তে মুহাম্মাদিয়ারই বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া পূর্বেকার কোনো উম্মতের মধ্যে জিহাদ ও কিতালের বিধান ছিল বটে কিন্তু যে পরিমাণ জিহাদ এ উম্মত ও তাঁর নবী করেছেন সেই পরিমাণ পূর্বেকার সকল উম্মত ও তাঁদের নবীরা করেন নি। এ উম্মতের জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন। এমনকি এ উম্মতের সর্বশেষ জিহাদ হবে দাজ্জালের বিরুদ্ধে।

ইমাম কাফফাল রহ. এও প্রমাণ করেছেন যে, যেহেতু জিহাদের মাধ্যমে মানুষের সবচেয়ে বড় স্বার্থ ঈমানের সংরক্ষণ নিশ্চিত হয় এবং সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর বস্তু কুফুরের অবসান ঘটে, সেহেতু জিহাদ মুসলমানদের সকল ইবাদতের চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই ফজিলতপূর্ণ ইবাদত যে উম্মতের মধ্যে যত বেশি পাওয়া যাবে, সে উম্মত তত বেশি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে। আর উম্মতে মুহাম্মাদিয়ায় জিহাদের বিধান ও বাস্তবতা আর সব উম্মতের চাইতে বেশি ব্যাপক ও কার্যকর, তাই এ উম্মত অন্যসব উম্মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। –আত তাফসীরুল কাবীর ১/১৮০

নফসের জিহাদ

'জিহাদ' ইসলামের একটি সুপরিচিত পরিভাষা। কুরআন-হাদীসে এ-শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে, আল্লাহর কালেমা তথা ইসলামকে বুলন্দ করার লক্ষ্যে ইসলামের দুশমনদের সঙ্গে সশস্ত্র লড়াই করা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অনেকেই তা বোঝে না। বুঝে-শুনে জিহাদ শব্দের ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আমরা যারা দুর্বলতার দরুন সশস্ত্র জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারছি না কিংবা জিহাদের কোনো রকম প্রস্তুতি নিচ্ছি না, তারা যে যে কাজে জড়িত, সে সে কাজকেই জিহাদ আখ্যা দিয়ে চলছি। সশস্ত্র জিহাদকে বলছি জিহাদে আসগর তথা ছোট জিহাদ। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছি যে, আমার এ-দাবি ও ব্যাখ্যা কি শরীয়ত সমর্থন করছে? একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, কুরআন ও হাদীসে এর কোনো সমর্থন নেই। কুরআন-হাদীস বরং এর বিরোধিতাই করছে। কাজটিকে

কুরআন ও হাদীসের তাহরিফ তথা ইসলাম বিকৃতির নামান্তর বলেই বিবেচনা করছে। হাদীস শরীফে নফসের-কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণকারীকে মুজাহিদ বলা হয়েছে ঠিক, কিন্তু হাদীসের প্রেক্ষাপট ও পূর্বাপর আলোচনা করলে এ-কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এমন ব্যক্তিকে পারিভাষিক অর্থে মুজাহিদ বলা হয় নি। এ বিষয়ে সমস্ত আয়াত ও হাদীস পর্যালোচনা দ্বারা এ-কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অস্বীকার করা বা পাশ কাটিয়ে যাওয়া অজ্ঞতারই পরিচয় বহন করে।

এছাড়া আরও একটি হাদীস এ বিষয়ে আমাদের মুখে বহুল আলোচিত, 'রণাঙ্গনের জিহাদ ছোট জিহাদ আর নফসের জিহাদ বড় জিহাদ।' কিন্তু হাদীস বিশারদদের মতে এটি হাদীস নয় বরং একজন মনীষীর উক্তি মাত্র, যার নাম ইবরাহিম ইবনে আবু আবলা। –মাজমূউল ফাতাওয়া- ইবনে তাইমিয়া ২/৪৮৭, আদ্ দুরারুল মানছুরা- সুয়ূতী ১/১১

যদি মেনেও নেওয়া হয়, সত্যিই এটি হাদীস, তা হলেও এর সঠিক ব্যাখ্যা ঠিক তাই হবে যা প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ বড় মুজাহিদ হলে সে বড় জিহাদ তথা নফসের জিহাদের সওয়াবই পাবে। তার জন্য পারিভাষিক জিহাদ ও মুজাহিদের ক্ষেত্রে বর্ণিত ফজিলতের দাবি কিছুতেই সঠিক হবে না। রিওয়ায়েতটির প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে সঠিক মর্ম অনুধাবনে আরও সহযোগিতা পাব বলে আশা রাখি।

রিওয়ায়েতটিতে দাবি করা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম যখন রণাঙ্গনে সশস্ত্র জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্বোধন করে বলেন, মনে রেখ, রণাঙ্গনে জিহাদ সমাপ্ত, আমাদের দায়িত্ব শেষ, এ-কথা মনে করে বসে থাকলে চলবে না। আমরা বরং ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। অর্থাৎ একজন মুজাহিদের শান নয় যে, সে রণাঙ্গনে সশস্ত্র জিহাদ করবে, অথচ মনের কুপ্রবৃত্তির মোকাবেলা করবে না। এবার বর্ণনাটির মর্মার্থ এই দাঁড়ায় যে, এতে মুসলমানদের ভবিষ্যতের দীনী কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং তাদের দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করে দেওয়া একমাত্র উদ্দেশ্য। অর্থাৎ রণাঙ্গনের জিহাদ করে এ-কথা ভাবলে চলবে না যে, আমি তো মুজাহিদ হয়ে গেছি, আমার আর কিছু করা লাগবে না। বরং রণাঙ্গনের জিহাদ তো একটি দায়িত্বমাত্র। একজন পরিপূর্ণ মুসলমানের দায়িত্বের পরিধি আরও সুদূরপ্রসারী। সুতরাং সেসব দায়িত্বপালনেও আমাকে সচেতন হতে হবে।

যেখানে রণাঙ্গনের জিহাদ সম্পাদনের পর অন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে; অথচ এখন কিনা রণাঙ্গনে যাবার পূর্বেই মুজাহিদে আকবর বনে যাচ্ছি!

উদাহরণ স্বরূপ আমরা এরকম আর একটি হাদীস আলোচনা করতে পারি। সাহাবায়ে কিরাম যখন কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ট তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে জন্মভূমি মক্কানগরী ছেড়ে হিজরত করে মদীনা গমন করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, প্রকৃত মুহাজির ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করে। –সহীহ বুখারী, ৯

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আমরা সুদ বর্জনকারীকে মুহাজির বলছি না। অথচ উক্ত হাদীসে তাকে মুহাজির বলা হয়েছে। কিন্তু তা সঠিক অর্থে হিজরতের যে ফজিলত বর্ণিত হয়েছে তা পারিভাষিক মুহাজিরের জন্য।

এ-হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুহাজিরের ভবিষ্যতের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে তোলা। অর্থাৎ হিজরত করে মুহাজির বনে গেছি বলে বসে পড়লে চলবে না বরং আল্লাহর সব নিষেধাজ্ঞা বর্জনেও আমাকে সচেষ্ট হতে হবে।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় কেউ যদি বলেন, আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় বর্জনকারীও মক্কা ত্যাগকারী মুহাজিরের মর্যাদা পাবে, তাহলে কি আমরা সমবেত কণ্ঠে তার প্রতিবাদ করব না? তাকে বলব না তুমি হাদীস বোঝ নি, তাই হাদীসের অপব্যাখ্যা করছ? হাদীসের তাহরিফ করছ? জবাব অবশ্যই ইতিবাচক। কিন্তু ভাববার বিষয় হচ্ছে, উল্লিখিত হাদীস দুটো ও পূর্বাপর অবস্থানের দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত হাদীসের সঙ্গে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। তথাপি আমরা তৃতীয় হাদীসটির যথাযথ মর্ম অনুধাবনে সচেষ্ট হলেও প্রথম দুটো হাদীসের ক্ষেত্রে একেবারে অমার্জনীয় উদাসীন। অনাকাঙ্ক্ষিত অবহেলার পরিচয় দিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করছি না। কিন্তু কেন? তলিয়ে দেখলে এর পিছনে দুটো কারণ পাওয়া যায়। প্রথম কারণ হচ্ছে, শয়তান আমাদেরকে বড় জিহাদের সঙ্গে জড়িত থাকার ধোঁকায় ফেলে যেমনিভাবে আত্মপ্রসাদে লিপ্ত করে দিয়েছে, তেমনি নফসের জিহাদ থেকেও দূরে সরিয়ে রাখতে পরিপূর্ণ বিচক্ষণতার পরিচয় দিচ্ছে। তাই আমরা যেখানে জিহাদে শরিক হতে না পারাটাকে নিজের দুর্বলতা মনে করতাম সেখানে নফসের কু-প্ররোচনার শিকার হয়ে জিহাদের অপব্যাখ্যায় লিপ্ত হয়েছি। ফলে নিজের যে কোনো কাজকে

জিহাদ আখ্যা দিয়ে দীনের তাহরিফে অংশ নিচ্ছি। উপরন্তু মুজাহিদদের সব ফজিলত নিজের জন্য দাবি করে সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহকে ধোঁকা দিয়ে তাদের সামনে জিহাদ বিষয়টিকে অতি ক্ষুদ্র ও সহজলভ্য বিষয় হিসেবে তুলে ধরছি। পরিণতিতে তাদের মন-মস্তিষ্ক, চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা থেকে জিহাদের মাহাত্ম্য, জিহাদি মনোভাব, উৎসাহ-উদ্দীপনা নষ্ট করছি, যা মুসলিম উম্মাহকে অতি দ্রুত অত্যন্ত ভীতিকর ও অশুভ পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ হচ্ছে, জিহাদ ইসলামের ভিত্তি এবং সুউচ্চ মিনার, জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে আমাদের পিছনে এক শ্রেণির কুচক্রীর সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র প্রতিনিয়ত সক্রিয় রয়েছে। আর এটিই আসল কারণ।

চরম ইসলাম বিদ্বেষী পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান সম্প্রদায় ইসলাম ও মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে মাঠে নেমে দেখছে যে, যতদিন পর্যন্ত এ জাতির জিহাদি মনোভাব নির্মূল করা না যাবে ততদিন তাদের খতম করা সম্ভব হবে না, তখন থেকেই মুসলমানদের কৃষ্টি-কালচার, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজ রাষ্ট্র-জুড়ে সর্বগ্রাসী ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে এবং ইসলাম রক্ষার কবজ জিহাদ বিষয়েও সংশয় সৃষ্টি করছে। আর একে মুসলিম নিধনের একমাত্র পথ হিসেবে বেছে নিয়েছে। আর আমরা অজান্তে এ ষড়যন্ত্রের সহজ শিকার হয়ে আনন্দের সঙ্গে তাদের প্রতিনিধিত্ব করে চলছি। এরচেয়ে হতভাগ্যের কথা আমাদের জন্য আর কী হতে পারে? বিশ্বজুড়ে আজ অসংখ্য মুসলিম শিশু, মা-বোনের আর্তচিৎকারে আকাশ, পৃথিবী কাঁপছে আর আমরা মৃত্যুভয়ে গা বাঁচিয়ে নাক-ডাকা ঘুমে বিভোর হয়ে বলছি, আমরা তো বড় জিহাদ করছি। আর যারা বুকের তাজা রক্তের স্রোত বইয়ে দিচ্ছে তারা ছোট জিহাদ করছে! কেন? তারা কি নফসের জিহাদ করছে না? তারা তো নফসের জিহাদের বেলায় সবার চেয়ে অগ্রগামী সিপাহির ভূমিকা পালন করছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন। নিচে জিহাদ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হল।

শাব্দিক অর্থে জিহাদ

الجهد অর্থ, শক্তি-সামর্থ্য ও আল্লাহর রাস্তায় নিজের সর্বশ্রম ব্যয় করা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের কথা ও কর্মের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা ব্যয় করা।

المعجم الوسيط ١/ ١٤٣ لسان العرب ٣/١٣٣

জিহাদের শরঈ সংজ্ঞা

উলামায়ে কিরাম থেকে জিহাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা বর্ণিত রয়েছে। তা থেকে কতিপয় সংজ্ঞা নিম্নে তুলে ধরা হল-

১. হানাফী মাযহাবের অন্যতম শীর্ষ ফকীহ আল্লামা কাসানি রহ.-এর উক্তি- নিজের শক্তি-সামর্থ্য, ধন-সম্পদ, জ্ঞান ও জবানকে আল্লাহর রাস্তায় কিতালের মাধ্যমে ব্যয় করা।

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ٧/٩٧ حاشية ابن عابدين ٤/١٢١

২. মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত আলিম আল্লামা ইবনে রুশ্‌দ রহ.-এর উক্তি হল- এলায়ে কালিমাতুল্লাহ্ বা আল্লাহর জন্য নিজের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা ব্যয় করা; আল্লাহ তাআলা যাকে জান্নাতের পথ বলে সাব্যস্ত করেছেন।

زاد المعاد ١/ ٢٥٩ حاشية الصاوى ٢/٢٦٧

৩. শাফেয়ী মাযহাবের আল্লামা বাজুরী রহ.-এর উক্তি হল- 'দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহর রাস্তায় কিতাল করাকে জিহাদ বলে।' الشرقاوى ١/٢٩٣

৪. হাম্বলী মাযহাবের আল্লামা বাহুতী রহ. এর উক্তি হল- কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে কিতাল করাই জিহাদ।

الروض المربع ١/١٧٦ المبدع فی شرح المقنع ٣/٣٨

দেখা যাচ্ছে যে, কিছু শাব্দিক পার্থক্য ছাড়া জিহাদ সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের তেমন কোনো মতানৈক্য নেই। তার সার সংক্ষেপ হল, قتال الكفار বা কাফেরদের সঙ্গে কিতাল করা। আর অর্থটি জিহাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় কিতালের মাধ্যমে নিজের সামর্থ ও সর্বশক্তি ব্যয় করার জন্যই উপযোগী হবে। কিন্তু সাধারণ অর্থে জিহাদ বলা হয় এলায়ে কালিমাতুল্লাহর জন্য শক্তি-সামর্থ ব্যয় করাকে।

এখানে শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থের মাঝে সামঞ্জস্য হচ্ছে, আল্লাহর রাস্তায় সর্বশক্তি ব্যয় করা এবং (اعلاء كلمة الله) এলায়ে কালিমাতুল্লাহর জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টার নামই যদি জিহাদ হবে, তাহলে এটা নিজের কথা, কর্ম, হাত ও জবানের মাধ্যমেও সম্ভব। অতএব অর্থ দুটোর মাঝে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই।

– কামুসুল ফিকহী ৭১, নাইলুল আওতার ৮/২৫, ফাতহুল বারী ৬/২, ফাতহুল আল্লাম ২/২৫১

জিহাদের প্রকারভেদ

উলামায়ে কিরাম অবস্থা ও অবস্থানের দিককে সামনে রেখে জিহাদকে কয়েক ভাগ করেছেন। ইবনুল কায়্যিম এগুলোকে مراتب বলে নামকরণ করেছেন। ১. جهاد الكفار বা কাফেরগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জিহাদ। ২. جهاد النفس বা নফসের সঙ্গে জিহাদ। ৩. جهاد الشيطان বা শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ। ৪. جهاد المنافقين বা মুনাফিকদের সঙ্গে জিহাদ। –যাদুল মাআদ ৩/১১

জিহাদের হুকুম

জিহাদের প্রধানত দুটি হুকুম, ফরজে আইন ও ফরজে কিফায়া।

ফরজে কিফায়ার বিধান হল, কোনো দেশ বা এলাকার কতিপয় লোক আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। আর এর ক্ষেত্র হল, যখন কাফেরগোষ্ঠী নিজ দেশে অবস্থানরত থাকে, মুসলমানদের কোনো কাজে তারা হস্তক্ষেপ না করে, মুসলমানদের ধর্মীয় কাজে বাঁধা না হয়ে দাঁড়ায় অথবা মুসলিম দেশের প্রতি শ্যেন দৃষ্টিতে না তাকায়।

ফরজে আইন বলা হয়, যা উম্মাহর কিছু সংখ্যক লোক আদায় করলে সকলের পক্ষ হতে আদায় হবে না। বরং তাতে সবার অংশগ্রহণ করতে হবে। তাতে অংশগ্রহণ করা উম্মাহর প্রত্যেক সদস্যের অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। যদি একজন এর থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে বা জিহাদ থেকে বিরত থাকে তবে অবশ্যই তার ফরজ ছেড়ে দেওয়ার গুনাহ হবে। আর এর ক্ষেত্র হল যখন কাফেরগোষ্ঠী কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে আক্রমণ করে।

بدائع الصانع ٩٨/٧ حاشية ابن عابدين١٢٢/٤ حاشية الصاوى ٢٧٤/٢ الاستذكار ١٣٠/٥
المهذب ٢٢٦/٥ الميزان الكبرى ١٧٥/٢ (٥)

জিহাদ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের কোনো মতভেদ নেই, যা কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। প্রমাণস্বরূপ তার কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হল।

কুরআনের আলোকে জিহাদ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

অর্থ- 'কিতালকে তোমাদের উপর অবধারিত করা হল যদিও তা তোমাদের মনঃপূত নয়।' –সূরা বাকারা-২১৬

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

অর্থ- 'আর তোমরা তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা অনুধাবন কর।'

–সূরা তাওবা : ৪১

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অর্থ- 'তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর যারা আল্লাহ ও কিয়ামতের দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে। –সূরা তাওবা : ২৯

আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَاۤفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَاۤفَّةً

অর্থ- 'আর তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণভাবে কিতাল কর যেরূপ তারা তোমাদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণভাবে কিতাল করে। আর তোমরা তাদের কতল করতে থাক, ফিতনার অবসান না হওয়া পর্যন্ত।' –সূরা তাওবা : ৩৬

হাদীসের আলোকে জিহাদ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ.

অর্থ- হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমরা তোমাদের জান, মাল ও জিহ্বার মাধ্যমে জিহাদ কর। –আবু দাউদ, ২৫০৬

ইজমার আলোকে জিহাদ

ইবনে আতিয়া বলেন, উলামায়ে কিরাম এ-ব্যাপারে একমত যে, জিহাদ মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেক সদস্যের উপর স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় ফরজে কিফায়া। অতএব উম্মাহর কিছু সংখ্যক লোক আদায় করে নিলে সকলের পক্ষ হতে আদায় হয়ে যাবে। তবে যখন শত্রুবাহিনী মুসলিম ভূখণ্ডে আক্রমণ করে বসবে, তখন সকলের উপর জিহাদ ফরজে আইন বা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে।

যে কয়েকটি কারণে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়।

১. বিপক্ষীয় সেনাদল যখন যুদ্ধের সামগ্রিক প্রস্তুতি নিয়ে কোনো স্থানে জমায়েত হবে এবং যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়াবে এমতাবস্থায় জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজে আইন হয়ে যাবে। এর থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে বা বিমুখ থাকলে ফরজে আইন তরকের গুনাহ হবে।

২. মুসলিম ভূখণ্ডে যদি শত্রুবাহিনী আক্রমণ করে বসে, তাহলে এমতাবস্থায় সে এলাকার বা সে দেশের সকলের উপর তাদের প্রতিহত করা ফরজে আইন হয়ে যাবে। সেই এলাকা বা দেশ যদি আক্রমণকারী বাহিনীর মোকাবেলা করতে সক্ষম না হয়, তবে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশের সকল মুসলমানের উপর ফরজে আইন হয়ে যাবে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা এবং দুশমনের উপর আক্রমণ করা।

১. القرطبی الجامع لاحکام القران ۸/۳۸

২. البدائع الصنائع ۷/۹۸ الاختیار ٤/۱۱۷ الشرح الصغیر ۲/۲۷٤ الحاوی ۱٤/۱٤٥ المغنی ۷/۳٤۷

৩. মুসলিম সেনাপ্রধান বা ইমাম যখন সেনা তলব করবে বা পুরুষ অথবা মহিলা কাউকে এই কাজে নিযুক্ত করবে, তখন তাকে সেনা দিয়ে সহায়তা করা সকলের জাতীয় ও ঈমানি কর্তব্য।

৪. কাফের-মুশরিক যদি কোনো মুসলিম নারী বা পুরুষকে আটক করে, তাকে শত্রুর অপমানজনক ও লাঞ্ছনাকর কারাগার হতে উদ্ধারার্থে এগিয়ে আসা সকলের কর্তব্য।

৫. মুসলমানদের এমন কিছু পেশাদার মুজাহিদ বা সৈনিক গঠন করাও কর্তব্য যারা বায়তুল মাল বা সরকারি কোষাগার থেকে বেতন-ভাতা গ্রহণ করবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী শত্রুদের উপর আক্রমণে বের হবে।

জিহাদের ক্ষেত্র

ইসলাম জিহাদকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এবং মুজাহিদিনের মর্যাদা অনেক উঁচু করেছে। অনেক ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব নামাযের চেয়েও বেড়ে যায়। কেননা নামাযকে কাজা করে অন্য সময় বা কিছুক্ষণ পর আদায় করা সম্ভব কিন্তু উত্তপ্ত ময়দানে জিহাদের কাজা সম্ভব নয়। তাই জিহাদের সময় কোনো কোনো ক্ষেত্রে নামাযকে কাজা করার হুকুম রয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহর সকল আমলের মধ্যে জিহাদকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সাওয়াবের কাজ বলে উল্লেখ করেছে ইসলাম। আম্বিয়ায়ে কিরামের পর শহীদি মৃত্যুর চেয়ে সম্মানজনক মৃত্যু আর নেই। তাই তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদি মৃত্যুর তামান্না প্রকাশ করেছিলেন বার বার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِيْ سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ.

আমি চাই, জিহাদে শরিক হব আর আমাকে কতল করা হবে। পুনরায় আমাকে জীবিত করা হবে, আবার আমাকে কতল করা হবে। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩ বার আবেগপূর্ণ এ-উক্তি পেশ করেছিলেন।

–সহীহ বুখারী, ৩৬

শহীদের ফজিলত অন্যান্য উম্মতের চেয়ে অনেক বেশি দেওয়া হয়েছে এবং মুসলিমজাতিকে আল্লাহর রাস্তায় কিতালের জন্য উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করেছে। ক্ষুধার্ত শার্দূলের ন্যায় দূরন্ত সাহস নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার শিক্ষা ইসলাম আমাদের দিয়েছে। অপর দিকে জিহাদের ব্যাপারে বিমুখতা প্রদর্শন করা থেকে ইসলাম সতর্ক করে দিয়েছে এবং কিতালের বিশেষ পদ্ধতি ও নিয়ম-শৃঙ্খলা শিখানো হয়েছে। মুজাহিদের সংখ্যা বৃদ্ধি, তাদের সহযোগিতা এবং শত্রুনিধনের লক্ষ্যে ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য স্পষ্ট আদেশ করা হয়েছে। মুজাহিদের ফজিলত ও জিহাদের ক্ষেত্র সম্পর্কে আল কুরআনে বহু আয়াত রয়েছে। হাদীস দ্বারাও জিহাদের তাৎপর্য প্রমাণিত। জিহাদের নির্দেশ, তার ফল, কিতালের পদ্ধতি সম্পর্কে আধুনিক ও পুরাতন ইসলামী গ্রন্থভাণ্ডার কানায় কানায় পূর্ণ। এতে শুধু পুরুষের জিহাদের বিবরণ দিয়েই ক্ষান্ত করা হয় নি। পুরুষের পাশাপাশি নারীদের জিহাদ করার পদ্ধতিও বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামের নীতিনির্ধারকগণের মতে ইসলামের

নির্দেশমালার যেসব স্থানে শুধু পুংলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে নির্দ্বিধায় নারীগণও সেসব নীতিমালার আওতায় এসে যাবে।

অতএব কিতালকে যখন ফরজ করা হয়েছে, তাই প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তির উপর তা অবধারিতরূপে বর্তাবে, সে নারী হোক বা পুরুষ।

জিহাদের তাৎপর্যকে সাধারণ ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহর ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করার সামর্থ্য আছে এমন প্রত্যেকের উপর এর-নির্দেশ জারি হবে।

অতএব কুরআন ও হাদীসে জিহাদ সম্পর্কিত যে সমস্ত আহকাম রয়েছে, তাতে নারী-পুরুষ সকলকে বোঝানো হয়েছে। সকলেই এর ধারক ও বাহক।

ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যায়, ইসলামী তাহজিব-তামাদ্দুনের ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, মদীনা ও হাবাশায় হিজরত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গাজওয়া, সাহাবাদের বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুদ্ধে নারীরা পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে অংশ নিয়েছেন। এ-ধরনের হাজারও কাহিনীতে ইতিহাস ভরপুর।

মদীনাকে ইসলামের শক্তিশালী দূর্গে রূপ দিতে শুধু পুরুষেরই অবদান ছিল না। জ্ঞান, ইবাদত-বন্দেগী, জিহাদ ও তারবিয়াত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ফতোয়া প্রদান, মোটকথা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা ছিল তুলনাহীন। ইতিহাস তাঁদের নিয়ে আজও গর্ব করে।

মুসলিম উম্মাহকে সম্মানের শীর্ষে উঠাতে, জাতির ললাট থেকে লাঞ্ছনা ও অপমানের কালো দাগ মুছে ফেলার জন্য প্রয়োজন সঠিক দিক-নির্দেশনার। জিহাদ ও নারীর মধ্যকার দূরত্বে সামগ্রিক দিক-নির্দেশনা জাতিকে দেওয়া প্রয়োজন। কারণ ইসলামের ভাষ্যে ও শরঈ দায়িত্বে নারী-পুরুষের সকলে নির্দেশপ্রাপ্ত। তবে উভয় শ্রেণির মধ্যে রয়েছে ক্ষেত্র ও অবস্থানগত কিছু পার্থক্য। অন্য ইসলামী নীতিমালা, যথা নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক নির্দেশনায় উভয় শ্রেণি এক। তদ্রূপ ইসলামের অন্যান্য আহকামও। المرأة والحقوق في الإسلام ص ١٠٠

শরীয়তের সকল আহকাম বা নীতিমালায় নারী-পুরুষ উভয়ে অন্তর্ভুক্ত। আর আমাদের পথের দিশারী সালাফে সালিহীন এ সমস্ত আহকাম এভাবেই আনজাম দিয়ে আমাদের জন্য উপমা কায়েম করে গেছেন। ইসলামের সাধারণ নির্দেশনায় নারী-পুরুষ কাউকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন নি তাঁরা। তাঁরাই কুরআনে সম্বোধিত। তাঁদের উপরই অবতীর্ণ হয়েছে পবিত্র আসমানি গ্রন্থ।

রাযিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাযু আনহু তাঁদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে। সে সমস্ত আহকাম থেকে কুরআন ও হাদীসে নারী-পুরুষের অন্তর্ভুক্তির কিঞ্চিৎ প্রমাণ উপস্থাপনার চেষ্টা করা হল-

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ

অর্থ- অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যকার কর্মনিষ্ঠ পুরুষ ও নারীর কৃত আমল নষ্ট করব না। তোমরা একে অপরের অংশ। অতএব যারা হিজরত করেছে এবং তাদেরকে তাদের বসতবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, নিজ গৃহ হতে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, আমি তাদের কৃত গুনাহ ও অপরাধসমূহ মাফ করে দেব। তাদেরকে এমন সুখময় বেহেশতে প্রবেশ করাব, যার তলদেশ দিয়ে স্বচ্ছ পানির নির্মল ফোয়ারা বয়ে গিয়েছে। তাদের প্রতিফল আল্লাহর পক্ষ হতে পুরস্কার। আর উত্তম পুরস্কার আল্লাহর নিকট। —সূরা আ-লে ইমরান : ১৯৫

উল্লিখিত আয়াতে উত্তম আমলকারী নারী-পুরুষ নির্বিশেষ সকল মুসলমানকে আল্লাহ তাআলার সু-সংবাদ শোনানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কাজের ধরন ও প্রকৃতিও বর্ণনা করা হয়েছে যা মুসলিম নর-নারী সম্পাদন করেছে। আর তা হল- হিজরত ও নিজের বসত-বাড়ি থেকে জোরপূর্বক উৎখাত হওয়া, কিতাল ও শাহাদাত আর এর সবকটি আল্লাহর নিকট গৃহীত।

উল্লিখিত আয়াতে মুসলিম নারীর হিজরত ও জিহাদ এবং কিতাল ও শাহাদাতের আলোচনা করা হয়েছে।

বর্ণিত আয়াতে মুসলিম নারী-পুরুষ সকলকে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত ও ধৈর্য ধারণের প্রতিদান, এলায়ে কালিমাতুল্লাহর লক্ষ্যে কতল হওয়া ও কতল করার দিকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আহ্বান করা হয়েছে। প্রথম পদক্ষেপে যদি কিতাল নারীর উপর ফরজ হয়ে থাকে, তাহলে নারীকে এর ফজিলত থেকে বঞ্চিত

করা আদৌ সমীচীন হবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْۤا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

অর্থ- যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে এবং সাহায্য করে তারা একে অপরের অভিভাবক। –সূরা আনফাল, আয়াত ৭২

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ

অর্থ- যারা ঈমান আনে আর যারা হিজরত করে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে তারাই আল্লাহর রহমতের আশাবাদী। –সূরা বাকারা, আয়াত-২১৮

উল্লিখিত আয়াতে নারী-পুরুষ উভয়ের যৌথ আমলের সমষ্টি তথা ঈমান, হিজরত, জিহাদ ও নুসরতের বর্ণনা রয়েছে।

মুসলিম নারী ঈমান, হিজরত ও নুসরতের কাজে অংশগ্রহণ তো করছেই। এটা জিহাদ নয় কি? আর এজন্যই ঈমান, হিজরত ও জিহাদের প্রশস্ত দরোজা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য চির উন্মুক্ত। ইসলামের প্রত্যেকটি রণক্ষেত্রে নারীগণ অংশ নিয়েছে এবং জিহাদের পতাকাকে সমুন্নত করেছে। মক্কায় অবতীর্ণ আয়াতে আল্লাহ তাআলা জিহাদের প্রতি সাধারণভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্যকরণ ছাড়াই ডেকেছেন।

ইরশাদ হয়েছে,

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ

অর্থ- যারা আমার রাস্তায় জিহাদ করবে আমি তাদের পথ সুগম করে দিব। –সূরা আনকাবুত, আয়াত ৬৯

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَ جَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ

অর্থ- আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর পরিপূর্ণভাবে।

-সূরা হজ, আয়াত ৭৮

وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا

অর্থ- আর তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের (বিরুদ্ধে) সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যাও।

–সূরা ফুরকান, আয়াত ৫২

উল্লিখিত আয়াতে জিহাদের নীতিমালাকে সাধারণভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জিহাদের ফরযিয়াত প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তির উপর সমানভাবে প্রযোজ্য। আরবী ভাষায় আদেশসূচক ক্রিয়াকে ওয়াজিব বা ফরজের জন্য ব্যবহার করা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিপরীতে স্পষ্ট কোনো প্রমাণ না পাওয়া যাবে। তাই এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, উল্লিখিত আয়াতে নারী-পুরুষ সকলকেই সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ উভয় লিঙ্গের জন্য বুঝাতে আরবীসহ সমস্ত ভাষায় এভাবেই সম্বোধন করা হয়।

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াতে কিতাল সম্পর্কে বলা হয়েছে, যদিও তা অবহিত করণের নমুনায়।

عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

অর্থ- আল্লাহ অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্য থেকে কতক অতিসত্বর রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে। আর কেউ কেউ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় দেশ ভ্রমণ করবে। আর একটি দল আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামে লিপ্ত হবে।

–সূরা মুয্যাম্মিল : ২০

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা নারী যদি ব্যবসায়ের জন্য বের হয়ে জমিনে কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে তাহলে وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ দ্বারা কেন কিতালের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না? অথচ আয়াতে একই ভঙ্গিতে উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, সমস্ত মুহাদ্দিসের মতে এখানে নারী-পুরুষ সকলকেই সম্বোধন করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে,

وَ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থ- আর তোমরা তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। –সূরা তাওবা, আয়াত ৪১

নারী যদি সশরীরে কিতালে অংশগ্রহণ করতে অক্ষম হয়, তবে এতটুকু শক্তি তার অবশ্যই আছে যে, সে যতটুকু সম্ভব, যে ক্ষেত্রেই সম্ভব টাকা পয়সা বা অন্য কোনোভাবে কিতালে সহায়তা করবে।

অতএব নারী যদি ধনী ও বিত্তবান হয়, ইসলামের কালিমা সমুন্নত করার লক্ষ্যে উল্লিখিত আয়াত অনুযায়ী মাল খরচ করা তার উপর ওয়াজিব যেরূপ একজন সামর্থবান পুরুষের উপর জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করা ফরজ।

কুরআনের বহু আয়াতে ঈমান ও জিহাদকে পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ

অর্থ- প্রকৃত মুমিন ওই সমস্ত লোক যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারপর তারা তাদের বিশ্বাস থেকে ফিরে যায় নি। আল্লাহর পথে তারা তাদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী। –সূরা হুজুরাত, আয়াত ১৫

ঈমানের দাবি অনুযায়ী অনুগত নারী নিজের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নারীগণ গাজওয়া ও বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। সত্য ধর্মের প্রচার-প্রসারে অংশ নিয়েছে। আল কুরআনের প্রত্যেকটি ডাকে হাসিমুখে লাব্বাইক বলেছে।

কিতাল, জিহাদ ও শাহাদাত এবং আল্লাহর রাহে খরচ করার ফজিলত সংবলিত বহু আয়াত ও হাদীস বর্ণিত রয়েছে, সে সমস্ত আয়াত ও হাদীসে নারী-পুরুষ উভয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং মুসলিম নারীদেরকে

জিহাদের ফজিলত, শাহাদাতের আজর ও সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করা আদৌ সমীচীন হবে না। যারা নিজেদের পৌরুষ ও বীরত্ব দিয়ে নিজেদের আমালসমূহকে জিহাদের রঙে রাঙিয়ে তুলেছেন তারা শহীদ হন বা গাজি, উভয়ের প্রশংসা আল্লাহ তাআলা কুরআনে করেছেন। সকল মুজাহিদ এবং অহুদযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল নারী-পুরুষ সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে,

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا

অর্থ- মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোনো পরিবর্তন করে নি।

–সূরা আহযাব, আয়াত ২৩

হাদীস ও ইতিহাসের আলোকে নারীর জিহাদ

নারীদের জিহাদে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত আহকাম নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদীসে স্পষ্ট বর্ণিত রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের জিহাদের চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। এ সমস্ত হাদীস আমাদেরকে মুসলিম নারীর জিহাদে অংশগ্রহণের ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা দেয়। অতীতের মুসলিম নারীর ভূমিকা ও সমকালীন প্রেক্ষাপটে মুসলিম নারীর করণীয় সম্পর্কে কোনো পাথর্ক্য ও বেশ-কম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন নি। এ-সম্পর্কিত প্রত্যেকটি হাদীস তার কার্যকারণ ব্যতিরেকেই বর্ণিত হয়েছে। এ সমস্ত হাদীসের নির্যাস মুসলিম নারীকে সশরীরে জিহাদে বের যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছে। তবে তাদের জিহাদের রূপ, প্রকৃতি ও অবস্থা বিভিন্ন হতে পারে, যেমন জখমিদের সেবা, তাদের ব্যান্ডেজ লাগানো, পানি সরবরাহ করা ও খানা পাকানো ইত্যাদি কাজ আনজাম দিয়ে তারা পুরুষ মুজাহিদদের সহযোগিতা করতে পারে। এগুলোও জিহাদের অংশ হিসেবে গণ্য হবে। অপর দিকে মুসলিম নারীর সরাসরি কিতালে অংশ নেওয়া সম্পর্কে ইতিবাচক ও নেতিবাচক যে সমস্ত হাদীস রয়েছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা সামনে

আসবে। প্রথমে নেতিবাচক এবং পরে ইতিবাচক হাদীস বর্ণনা করা হবে, যাতে তার উত্তর বোঝা সহজ হয়।

হাদীসে এসেছে,

عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ [رضي الله عنها] قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي، وَنُدَاوِي الْجَرْحَى، وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ

অর্থ- হযরত রুবায়্যি বিনতে মুয়াওয়িয়জ রাযি. বলেন, আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে [যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম] জখমিদের পানি পান করাতাম ও তাদের চিকিৎসা করতাম, আর শহীদদের লাশ মদীনায় বয়ে নিয়ে আসতাম। –সহীহ বুখারী-২৮৮২

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا، فَيَسْقِينَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى.

অর্থ- হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে যাওয়ার সময় হযরত উম্মে সুলাইম রাযি. কিছু আনসারি মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তারা পানি পান করাত এবং জখমিদের শুশ্রূষার কাজে নিয়োজিত থাকত। –মুসলিম শরীফ, ৪৭৮৫

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَخْلُفُهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ، فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ، وَأُدَاوِيْ الْجَرْحَى وَأَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضَى.

অর্থ- হযরত উম্মে আতিয়া আনসারিয়্যাহ রাযি. বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তাদের পিছনভাগে থাকতাম। আমি তাদের জন্য খানা তৈরি করতাম এবং আহত মুজাহিদদের জখমে ব্যান্ডেজ লাগাতাম। অসুস্থদের শুশ্রূষা করতাম। –মুসলিম শরীফ, ৪৭৯৩

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ الْجِهَادِ، فَقَالَ: جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ. وَفِيْ رِوَايَةٍ، سَأَلَهُ نِسَائُهُ عَنِ الْجِهَادِ، فَقَالَ: نِعْمَ الْجِهَادُ الْحَجُّ.

অর্থ- হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন, তোমাদের জিহাদ হল হজ। অন্য এক রেওয়ায়েতে এভাবে এসেছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর স্ত্রীরা জিহাদ সম্পর্কে জানতে চাইলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উত্তম জিহাদ হল হজ। –সহীহ বুখারী, ২৮৭৫, ২৮৭৬

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, মহিলাদের উপর কিতাল ফরজ নয়। তদ্রূপ আরও কিছু হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রাথমিকভাবে মহিলাদের উপর জিহাদ ওয়াজিব নয়। এ-কারণেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ কিছু সময়ে মহিলাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার অনুমতি দেন নি।

সামনে এই হাদীস দুটোর সুস্পষ্ট উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। ইবনে বাত্তাল বলেন, আয়েশা রাযি.-এর এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের উপর জিহাদ ওয়াজিব নয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তারা নফল হিসাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। –ফাতহুল বারী ৬/৮৭ (২৮৭৫)

জিহাদ সম্পর্কিত হযরত আয়েশা রাযি.-এর অন্য একটি হাদীস,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ فِيْهَا سَهْمِيْ، فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ.

অর্থ- হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সফরে যেতে মনস্থ করতেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের

মধ্যে লটারি দিতেন। লটারিতে যাঁর নাম আসত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সফরে যাওয়ার সৌভাগ্য তাঁরই হত। এমনি এক যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মমাফিক লটারি দিলে তাতে আমার নাম এলে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধে বের হলাম। এটা পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। –সহীহ বুখারী, ২৮৭৯

عن انس بن مالك رض قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، وإنهما المشمرتان، أرى خدم سوقهما تَنقُزان القِرب، وقال غيره: تنقلان القرب، على متونهما، ثم تفرُغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان، فتفرُغانه في أفواه القوم.

অর্থ– হযরত আনাস বিন মালিক রাযি. বলেন, অহুদের যুদ্ধে যখন সাহাবাগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পৃথক হয়ে গেল, তখন হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর ও হযরত উম্মে সুলাইমকে দ্রুত চলতে দেখলাম। দেখলাম, তাঁরা নিজ কাঁধে করে পানি বয়ে এনে জখমি সাহাবীদের মুখে তুলে ধরছে। পানি শেষ হয়ে গেলে এভাবে পুনরায় পানি এনে জখমি সাহাবাদের পানি পান করাচ্ছে। –সহীহ বুখারী, ২৮৮০

عن أنس بن مالك، أن أم سليم إتخذت يوم حنين خنجرا، فكان معها، فرأها أبو طلحة، فقال: يا رسول الله! هذه أم سليم معها خنجر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماهذا الخنجر؟ قالت: إتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقَرتُ به بطنَه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك.

অর্থ– হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, হুনায়নের যুদ্ধে হযরত উম্মে সুলাইম রাযি. নিজের সঙ্গে একটি খঞ্জর নিয়ে নিলেন। আবু

তালহা রাযি. তা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! উম্মে সুলাইম সঙ্গে খঞ্জর নিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সুলাইমকে বললেন, খঞ্জর দিয়ে কী করবে তুমি? তিনি বললেন, যদি কোনো মুশরিক আমার নিকট আসে আমি তার পেট চিরে দেব এই খঞ্জর দিয়ে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে মুচকি হাসলেন।

–মুসলিম শরীফ, ৪৭৮৩

كتب نجدة [الحروري] إلى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقدكان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويُحذَين (يعطين) من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن.

অর্থ– নাজদাতুল [হারুরি] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-কে এই মর্মে চিঠি লিখলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে গাজওয়ায় বের হতেন? এবং গনিমতের মাল থেকে কি তাদের কোনো অংশ থাকত। হযরত ইবনে আব্বাস তাঁর উত্তর লিখে পাঠালেন, তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছ যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের নিয়ে যুদ্ধে বের হতেন কি না? হ্যাঁ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের নিয়ে যুদ্ধে বের হতেন। তাঁরা আহতদের জখমে পট্টি বাঁধত। আর তাঁদেরকে গনিমতের মাল থেকে কিছু দেওয়া হত। তবে তাঁদের কোনো সুনির্দিষ্ট অংশ ছিল না। –সহীহ মুসলিম, ৪৭৮৭

প্রথম দিককার হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণ হয়েছিল যে, নারীগণ জিহাদে যেতেন না। কিন্তু পরবর্তী হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গেল যে, মহিলাগণ যুদ্ধে বের হতেন তবে অস্ত্র নিয়ে মুখোমুখি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন না বরং ওষুধ-পথ্য সরবরাহ ও অন্যান্য কাজে নিয়োজিত থাকতেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে জিহাদের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা কতটুকু বা কিভাবে হতে পারে সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে। তার আগে এ প্রসঙ্গে আরও কিছু হাদীস।

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان، فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطعمتْه، وجعلت تَفْلِي رأسَه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت: ما يضحك يارسول الله؟ قال: ناس من أمتى عرضوا عَلَيّ غُزاةً فى سبيل الله، يركبون ثَبَجَ هذا البحر ملوكا على الأَسِرَّة، أومثل الملوك على الأَسِرَّة، قالت: فقلت: يا رسول الله! أُدْعُ الله أن يجعلنى منهم، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع رأسه، ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت: ما يضحك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتى عرضوا عَلَيَّ غُزاةً فى سبيل الله، كما قال فى الأولى، قالت: فقلت: يارسول الله! ادْعُ الله أن يجعلنى منهم، قال: أنتِ من الأوّلين، فركِبتِ البحرَ فى زمان معاوية بن أبى سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجتْ من البحر فهلكتْ.

অর্থ- হযরত আনাস বিন মালিক রাযি. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোবায় গেলে হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহানের ওখানে যেতেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খানা খাওয়াতেন। তিনি ছিলেন হযরত উবাদা বিন সামেত রাযি.-এর পত্নী। এমনি একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কুটিরে তাশরিফ নিলেন। হুযুরকে তিনি খানা খাওয়ালেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় উকুন খুঁজছিলেন। [উল্লেখ্য যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় কখনো উকুন ছিল না। এটা অভ্যাসগত আচরণের বহিঃপ্রকাশ হবে।]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঁখিযুগলে ঘুম নেমে এল। হঠাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। উম্মে

হারাম বলেন, আমি হুযুরকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কী কারণে আপনি হাসছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের এমন কিছু লোককে আমার সামনে পেশ করা হয়েছে, যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে ঘোড়সওয়ার হয়ে যায়। তাঁদের সঙ্গে যুগের বাদশার পরিবারও ছিল। হযরত উম্মে হারাম বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করুন- আমিও যেন তাঁদের মধ্যে শামিল হতে পারি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দুআ করলেন এবং পুণরায় ঘুমিয়ে পড়লেন। হাস্যরত অবস্থায় আবার জেগে উঠলেন। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেন হাসছেন হে আল্লাহর রাসূল! হুযুর বললেন, আমার উম্মতের কিছু লোককে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদরত। যেমন প্রথমবার বলেছেন। উম্মে হারাম বলেন, তারপর আমি বললাম, আমার জন্য দুআ করুন আমি যেন তাঁদের মধ্যে শামিল হতে পারি। হুযুর বললেন, তুমি প্রথমদের একজন।

এরপর তিনি হযরত আমির মুয়াবিয়া রাযি.-এর যুগে সমুদ্রপথে (জিহাদের উদ্দেশে) যাত্রা করলেন। জাহাজ হতে নিচে অবতরণের সময় নিজের সাওয়ারি হতে ভূপাতিত হয়ে নদীগর্ভে নিমজ্জিত হন। –সহীহ বুখারী, ২৭৮৯

উম্মে হারাম সেই মহীয়সী নারী যিনি জলভাগে ইসলামের প্রথম শহীদ।

উল্লিখিত হাদীসে নবীজি ওই সমস্ত মুজাহিদের প্রশংসা করেছেন যাঁরা খরস্রোতা নদীর বুক চিরে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশে বেরিয়েছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের জন্য বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্তির দুআ করেছেন। জিহাদে বের হওয়া নারীর জন্য যদি নিষিদ্ধ হত তবে কেন নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হারামের জন্য দুআ করলেন?

اشتركت صفية بنت عبد المطلب فى معركة الخندق وقتلت رجلا من اليهود كان يطيف بالحصن الذى كانت فيه وكانت هى أول إمرأة مسلمة قتلت من المشركين (ابن القيم زاد المعاد ٤/١٢٤)

অর্থ- খন্দকের যুদ্ধে হযরত সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং একজন ইহুদিকে কতল করেছিলেন। সে ওই দূর্গের আশপাশে পায়চারী করছিল যে দূর্গে সাফিয়া ছিলেন। তিনি ইসলামের প্রথম মহিলা যিনি কোনো মুশরিককে জাহান্নামের ঘাটে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

–যাদুল মাআদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১২৪, বায়হাকী-১২৭৭২, হাকেম-৭০১৮

قسم عمر بن الخطاب مُرُوطا بين نساء من نساء أهل المدينة، فبقي منها مِرْط جيّد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين! أعط هذا بنتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي، فقال عمر: أم سليط أحق به، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر: فإنها كانت تُزْفِر لنا القِرَب يوم أُحُد.

অর্থ- আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাযি. মদীনায় মহিলাদের মাঝে কিছু পরিধেয় বস্ত্র বন্টন করছিলেন। সবশেষে একটি উন্নতমানের পোশাক রয়ে গেল। উপস্থিত লোকেদের মধ্য হতে একজন বলল, হে আমিরুল মুমিনীন! এই পোশাকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৌত্রিকে দেওয়া হোক, যিনি আপনার নিকটেই আছেন। অর্থাৎ উম্মে কুলসুম বিনতে আলী রাযি.। হযরত ওমর রাযি. বললেন, উম্মে সুলাইত এর অধিকতর হকদার। কেননা উম্মে সুলাইত আনসারি মহিলাদের এমন একজন, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিহাদের বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। হযরত ওমর রাযি. বললেন, অহুদের দিন তিনিই আমাদের নিকটবর্তী ছিলেন। সুতরাং এই পোশাকের যথাযথ হকদার তিনি।

–সহীহ বুখারী, ৪০৭১

হযরত ওমর রাযি. উম্মে সুলাইতকে জিহাদে অংশগ্রহণ করার সুবাদে তাঁকে অধিকতর হকদার বলে ঘোষণা দিলেন।

উলামায়ে কিরাম ও ফকিহগণের উক্তি

উলামায়ে কিরাম ও ফুকাহায়ে ইজাম নারীর জিহাদ সম্পর্কে ওই হুকুম

বর্ণনা করেছেন, যা পুরুষের বেলায় প্রযোজ্য। কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদের আহকাম নারী-পুরুষ সকলের জন্য সমান থাকবে। যদিও ক্ষেত্র কিছুটা ভিন্ন। জিহাদের ময়দানে নারীর দায়িত্ব সম্পর্কে মুসলিম স্কলারদের দৃষ্টিভঙ্গি এটাই। জিহাদের ময়দানে নারীর কাজ ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে ইসলামী মনীষীদের কিছু উক্তি নিচে তুলে ধরা হচ্ছে, যাতে মুসলিম নারীর জিহাদের প্রকৃত অবস্থা, চিত্র ও ক্ষেত্র বেরিয়ে আসে। আর এটি সেই চিত্র যা সম্পর্কে বহুদিন যাবৎ একদল মুসলমানের স্মৃতিকে আন্দোলিত করে রেখেছে। তাদের ভাষ্যে মনে হয় জিহাদের দায়িত্ব-কর্তব্য মুসলিম নারী থেকে অবশ্যম্ভাবীরূপে রহিত করা হয়েছে। আমরা আজ এমন এক ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন, চারদিক থেকে বিজাতি জোট বেঁধে মুসলিমজাতিকে তার মূল থেকে উপড়ে ফেলার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে মুসলিম ভূখণ্ড রক্ষা ছাড়া উম্মাহ আর কী ভাবতে পারে? নারীর জিহাদ সম্পর্কে বিশ্ববরেণ্য উলামায়ে কিরামের উক্তি নিচে তুলে ধরা হল। তুলে ধরা হল তাদের মতানৈক্যও, যাতে এ-ব্যাপারে কোনোরকম সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

১. হানাফী মাযহাবের ইমাম কাসানী রহ. এর উক্তি হল- শিশু ও নারীর উপর জিহাদ ফরজ নয়। কেননা প্রকৃতিগতভাবে তারা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম নয়।

الكاسانى البدائع ٩٨/٧ الأختيار ١١٨/٤ اللباب ١١٩/٤

২. মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম খলিল রহ.-এর উক্তি হল- জিহাদ সর্বদা সামর্থবান প্রত্যেক আজাদ ব্যক্তির উপর ফরজে কিফায়া।

ইবনে রুশদ বলেন, জিহাদের জন্য পুরুষ হওয়া শর্ত, কেননা ঘরে অবস্থান করা ব্যতীত নারীর উপর কোনো আদেশ অবতীর্ণ হয় নি।

مقدمات ابن رشد ٢٦٧/١ بداية المجتهد ٤٠٨/٣

৩. শাফেয়ী মাযহাবের আল্লামা শাররিনী বলেন, জিহাদের ফরিজা শিশু, পাগল, রুগ্ণ ব্যক্তি, পঙ্গু ও নারীর উপর আরোপিত হবে না। বাজিরিমী বলেন, لاجهاد على انثى و خنثى নারী ও হিজড়াদের উপর জিহাদ ফরজ নয়। ইবনে জামায়ার উক্তি হল, ফরজে কিফায়া জিহাদের হুকুম আরোপিত হওয়ার জন্য মুসলমান, জ্ঞানী, বয়ঃপ্রাপ্ত, আজাদ, সুস্থ ও সামর্থ্যবান পুরুষ হওয়া শর্ত।

مغنى المحتاج ٢١٦/٤ تحرير الأحكام صـــ ١٠٦

৪. হাম্বলী মাযহাবের ইবনে কুদামা রাযি.-এর উক্তি হল, জিহাদ ফরজ হওয়ার জন্য সাতটি শর্ত-

১. মুসলমান হওয়া। ২. বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া। ৩. জ্ঞানী হওয়া। ৪. আজাদ হওয়া। ৫. পুরুষ হওয়া। ৬. বিশেষ কিছু রোগ থেকে মুক্ত থাকা, যা জিহাদের জন্য প্রতিবন্ধক হয়। ৭. খরচ বহনে সক্ষম হওয়া।

পুরুষ হওয়ার শর্ত লাগানো হযরত আয়েশা রাযি. এর হাদীস থেকে প্রমাণিত, জিহাদ মহিলাদের উপর ফরজ হবে না। কারণ তারা এর শক্তি রাখে না। ابن قدامة المغنى ٧/٢٤٧

ফুকাহায়ে কিরামের অভিমত অনুযায়ী নারীদের ক্ষেত্রে জিহাদের হুকুম নেতিবাচক সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ হিসেবে তাদের দুর্বলতাকে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ নারীজাতি প্রকৃতিগতভাবে যুদ্ধবিগ্রহের শক্তি রাখে না। কিন্তু এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরাম সবাই একমত যে, সামর্থবান ব্যক্তির উপর জিহাদ ফরজ। কারণ যদি তাই হবে, তবে প্রত্যেক সামর্থবান নারীর উপরও জিহাদের ফরিজা আরোপিত হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, নারীর উপর জিহাদ ফরজ নিয়ে প্রশ্ন তখনই উঠবে যখন মুখোমুখি লড়াই করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। আর এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আজকাল মুখোমুখি লড়াইয়ের ক্ষেত্র কোথাও নেই। পৃথিবীর সবস্থানে বারুদ ও আধুনিক অস্ত্রের মাধ্যমে লড়াই হচ্ছে।

উল্লিখিত প্রমাণাদির ভিত্তিতে আমরা হযরত আয়েশা রাযি.-এর جهاد المرأة الحج অর্থাৎ হজই হচ্ছে নারীর জিহাদ হাদীসের এই ব্যাখ্যা করব যে, উম্মাহর উপর জিহাদ ফরজে আইন হবে না যতক্ষণ না তারা সামর্থবান হবে অথবা জিহাদের শক্তি-সামর্থ রাখে না এমন মহিলাদের বেলায় হজই তাদের জিহাদ।

তাই হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাদীসের ভিত্তিতে নারীদের জিহাদ থেকে বারণ করা, জিহাদের আজর ও সাওয়াব থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা আদৌ সমীচীন হবে না। সালাফে-সালেহীনের আমল ও ইতিহাস দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট প্রমাণ করেছে যে, প্রথম পর্যায়ের মুসলিম নারীর উপর জিহাদ না থাকা সত্ত্বেও ইসলামকে তাজা ও সুরক্ষিত রাখার জন্য, ইসলামকে পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখার জন্য সর্বযুগে নারীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে উজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। যখনই জিহাদের ডাক এসেছে হাসিমুখে তাতে

সাড়া দিয়েছেন তারা। নিজের পক্ষে সম্ভব না হলে প্রয়োজনে পিতা-পুত্র অথবা স্বামীকে উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে তারা অংশ নিয়েছেন। তারা কখনো উম্মাহকে ধোঁকা দেন নি।

ওইসমস্ত নারী যাঁরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের অনুমতি দেন নি, এর কারণ তারা মুখোমুখি লড়াইয়ের অনুমতি চেয়েছিল। অন্যদিকে হযরত কাবশা রাযি. এর মারফু হাদীস-

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: لو لا أن تكون سنة وأن يقال: فلانة خرجت لأذنت لك، ولكن اجلسي.

অর্থ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, যদি এটি একটি বাহানা না হত এবং যদি এ-কথা বলা না হত অমুককে অনুমতি দেওয়া হয়েছে (আমাকেও দেওয়া হোক) আমি তোমাকে অনুমতি দিয়ে দিতাম কিন্তু তুমি ঘরেই থাক। -তাবারানী কাবীর, ৪৩১

এ-কারণেই কোনো কোনো ফুকাহায়ে কিরাম ফিতনার আশঙ্কা হলে যুবতী নারীদের জিহাদে যেতে বারণ করেছেন। বিগত যৌবনা নারী এই হুকুমের আওতায় আসবে না। المرداوى الأنصاف ٤/١٤٢

কিন্তু আল কুরআন কাউকে ফরযিয়াতের হুকুম থেকে পৃথক করে নি। জিহাদের ওয়াজিব থেকে কাউকে নিষ্কৃতি দেয় নি। আল কুরআন সাধারণভাবে নারী-পুরুষ সকলকে একই শব্দে সম্বোধন করেছে। কুরআনের স্পষ্ট বাণী, كتب عليكم القتال তবে অনিবার্য কারণে কতিপয় লোককে এই হুকুম থেকে বাদ রাখা হয়েছে। কুরআনের বাণী-

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ

অর্থ- অন্ধ-বধির, পঙ্গু ও রোগীর জন্য জিহাদের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। –সূরা ফাতহ, আয়াত ১৭

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ

অর্থ- অসুস্থ, রোগী এবং ওই সমস্ত লোক যারা জিহাদে যাওয়ার ব্যয়ভার বহনে অক্ষম, এ সমস্ত লোককে ধরপাকড় করা হবে না। -সূরা তাওবা, ৯১

অতএব নারী যদি অন্ধ, বধির, বিকলাঙ্গ বা রোগী না হয় সেও এই সাধারণ ঘোষণার আওতায় আসবে। কারণ কুরআনের কোথাও ليس على النساء উল্লেখ নেই। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বাহ্যত তার বিপরীত মনে হচ্ছে جهادكن الحج নারীদের জিহাদ হচ্ছে হজ। এর অর্থ এই নয় যে, মহিলারা জিহাদে যেতে পারবে না। হাদীসে মহিলাদের সেই জিহাদের জন্য নিষেধ করা হয়েছে যা মুখোমুখি সঙ্ঘটিত হয়। কারণ খোদ হাদীসের রাবীও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একাধিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

বরং তাঁদের কাজই পানি পান করানো, জখমিদের সেবা-শুশ্রূষা করা, তাদের দেখভাল করা, খানা পাকানো ইত্যাদি। হাদীস দ্বারা এতটুকু বোঝা যায় যে, তাদের জিহাদ থেকে নিষেধ করা হয়েছে পর্দার হুকুম অটুট রাখার জন্য। কারণ তখনকার যুদ্ধে সেনাবাহিনী লড়াইয়ে মুখোমুখি অবস্থান নিত। ঢাল-তলোয়ারের যুদ্ধ ছিল তখন। এতে একদিকে নারীর পর্দার মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটবে, অপর দিকে পুরুষদের সম্মুখে মুখোমুখি লড়াইয়ে নারীদের হিম্মতইবা কতটুকু!

কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। অধিকাংশ সময় এও জানা থাকে না যে আক্রমণটা আসছে কোন্ দিক থেকে। অতএব কারণের পরিবর্তনে তার বিধানও পরিবর্তন হবে।

الصنعانى سبل السلام ٤/٥٤ القنوجى فتح العلام ٢/٢٠٢

নারীর জিহাদের ধরণ ও প্রকৃতি

মালের মাধ্যমে নারীর জিহাদ

বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করা মুস্তাহাব। ইসলামের এমন কিছু আরকান রয়েছে যা মালের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার উপকারিতা, আজর ও সাওয়াবের ব্যাপারে বহু রিওয়ায়েত

এসেছে। কিয়ামতের ময়দানে তাদের বিশেষ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। আর জিহাদ বিল মাল। এ-ব্যাপারে কুরআনে বহু আয়াত রয়েছে। সেনা পরিচালনায়, তাদের খাদ্য পানীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করা ও অস্ত্রের জন্য অর্থ অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু। মানবসম্প্রদায় তাদের সাধারণ কাজও অর্থ ব্যতীত সম্পাদন করতে পারে না। তাহলে যুদ্ধের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ অর্থ ব্যতীত কিভাবে সম্ভব? জিহাদের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অর্থ প্রয়োজন। তাছাড়া আধুনিক যুগে আধুনিক অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধ-জিহাদ কল্পনা করা যায় না। আর এই অস্ত্রের জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ অর্থসম্পদের। এ ক্ষেত্রে বলা যায়, বিশ্বে তারাই সবচেয়ে শক্তিশালী যাদের সম্পদ বা অর্থের যোগান বেশি রয়েছে। আর অর্থের মাধ্যমে নারীর জিহাদ ইসলামে জিহাদের একটি রূপ। কুরআনে জিহাদ বিন নফস ও জিহাদ বিল মালকে অধিকাংশ জায়গায় একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। وَجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ অর্থাৎ, জান-মাল দিয়ে তোমরা জিহাদ কর। এখানে উভয়টি দিয়েই জিহাদের নির্দেশ করা হচ্ছে। الامر يفيد الوجوب مالم يقم دليل على خلافه আদেশসূচক ক্রিয়া ওয়াজিব করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এখানে নারীগণ পুরুষদের মতো ইসলামের নীতিমালায় সাধারণ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত। আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মাল ও নফস উভয়টি দ্বারা জিহাদ। অন্য রিওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রাথমিকভাবে নারীর উপর মুখোমুখি জিহাদ ফরজ নয়। তবে জিহাদ সাধারণ অর্থে তাদের উপর ওয়াজিব। শুধু কিতাল থেকে তাদেরকে দূরে রাখা হবে; তাও মুখোমুখি লড়াইয়ে। পরিস্থিতি যদি মুখোমুখি যুদ্ধের না-হয় তাহলে নারীদেরকেও এ-থেকে পৃথক করা যাবে না। নারীদের মুখোমুখি লড়াই হতে এ-কারণে দূরে রাখা হচ্ছে যে, তারা কোমলমতী। কিন্তু জিহাদ বিল মালের জন্য কঠিনপ্রাণ বা লৌহমানব হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং কোমলতা দানের ক্ষেত্রে প্রভাব বেশি রাখাই যুক্তিযুক্ত। আয়াতে নফস ও মাল উভয়টির সমন্বয়ে জিহাদের নির্দেশ পাওয়া যায়। যেমন হজ সম্পর্কিত আয়াতে বলা হয়েছে مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا আর সামর্থ মাল ও শারীরিক উভয়টির সমন্বয়ে হয়ে থাকে। তদ্রূপ কিতালের ক্ষেত্রে (মাল ও শারীরিক) সামর্থবান ব্যক্তির উপর তা ফরজ হবে। তবে কোনো কারণে যদি জিহাদে সরাসরি অংশ নিতে না পারে, তাহলে অবশ্যই মাল দিয়ে সহায়তা করতে হবে যদি সামর্থবান হয়। আল্লামা রাজী ও

জামাখশারী আয়াতের ব্যাখ্যা এটাই করেছেন।

আল্লামা ইবনে কাইয়ুম বলেন, জিহাদ বিল মাল ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে দুই ধরনের উক্তি রয়েছে। তবে সঠিক কথা হল তা ওয়াজিব। কেননা কুরআনুল করীমে জিহাদ বিল মাল ও নফস উভয়টি সমভাবে এসেছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

অর্থ- আর তোমরা প্রস্তুত কর তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি-সামর্থের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোনো হক অপূর্ণ থাকবে না। –সূরা আনফাল : ৬০

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নর-নারীকে শত্রু থেকে প্রতিরক্ষার নির্দেশ দিচ্ছেন। এখানে قوة কে অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা হয়েছে, যা সর্বসাধারণকে বোঝানোর লক্ষে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম, নারী হোক বা পুরুষ, যে কোনো অবস্থাতেই থাকুক না কেন। পুনরায় ومن رباط الخيل এর মাধ্যমে এক বিশেষ শক্তি গ্রহণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ঘোড় দৌড় তখনকার যুগে বিশেষ যুদ্ধাবস্থায় জন্য ব্যবহৃত হত। এদ্দ্বারা বোঝা যায় যুগের চাহিদা অনুযায়ী অত্যাধুনিক অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেওয়া, মুসলিমজাতির নৈতিক দায়িত্ব। মুসলিম ধনাঢ্য মহিলা তার মাল জিহাদে খরচ ও বাহিনী প্রস্তুতকরণের সামর্থ্য রাখে। আরবীতে যাকে قتال بالمال বলা হয়। তাই এটা তার উপর ওয়াজিব হবে। إعداد বা যুদ্ধনীতি প্রণয়ন ও প্রস্তুতিগ্রহণ। এটি একটি মৌলিক শব্দ। এর অনেক অর্থ হতে পারে। প্রস্তুতিকরণ সরাসরিও হতে পারে আবার গোপনেও

হতে পারে। সামরিক, সাংগঠনিক, রাজনৈতিক, সব ধরনের হতে পারে। যার যে অবস্থায় যেটি সম্ভব তাকে দিয়েই এই জিহাদি কাজ আনজাম দিতে হবে।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا

অর্থ- আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহ রাহে কিতাল করছ না। অথচ দুর্বল নারী-পুরুষ ও শিশুরা চিৎকার করে বলছে, প্রভু হে! আমাদের এই অত্যাচারী জনবসতি থেকে মুক্তি দাও। আর দাও তোমার পক্ষ হতে আমাদের পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী। –সূরা নিসা, ৭৫

আল কুরআন সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে জিহাদ ও কিতালের দিকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করছে। দুর্বল লোকেদের মুক্তির জন্য। তাদের শত্রুদের অপমানজনক ও লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে উদ্ধার করার জন্য। আর এটা সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমেও হতে পারে অথবা দুর্বল জনগোষ্ঠিকে মাল দিয়ে সহায়তা করেও হতে পারে। ইবনুল আরাবী বলেছেন, উদ্ধারের জন্য কিতাল ওয়াজিব। যদিও তাতে জানের ক্ষতি হয়। আর তাদের সাহায্যে মাল খরচ করাও ওয়াজিব। ইমাম মালিক রহ. বলেছেন, তাদের উদ্ধারার্থে প্রয়োজনে সমস্ত সম্পদ উজার করে দেওয়া ওয়াজিব।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ...

অর্থ- আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করে নি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নেই। আর দীন সম্বন্ধে যদি তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। –সূরা আনফাল, আয়াত ৭২

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, দারুল হরবে অবস্থানরত মুসলিম

জনগোষ্ঠী যদি তাদের উদ্ধারের জন্য সাহায্য তলব করে তাহলে তাদের উদ্ধার করা অথবা মাল ইত্যাদি দিয়ে তাদের সহায়তা করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। ইমাম কুরতুবী রহ. আয়াতের ব্যাখ্যা এটাই করছেন।

হাদীস শরীফে এসেছে,

من جهّز غازيًا في سبيل الله فقد غزا، ومن خَلَف غازيًا في سبيل الله بخير فقد غزا.

অর্থ- যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে যুদ্ধরত মুজাহিদকে জিহাদি সরঞ্জাম দিয়ে প্রস্তুত করল, প্রকৃতপক্ষে সেও জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি বিশেষ কল্যাণার্থে মুজাহিদকে জিহাদ থেকে পিছনে হটিয়ে রাখল সেও জিহাদের সাওয়াব পাবে।
–সহীহ বুখারী, ২৮৪৩

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের কয়েকটি ধরন বর্ণনা করলেন। অর্থাৎ যে যুদ্ধস্থলে অংশগ্রহণ করল, অথবা মুজাহিদকে যুদ্ধের সরঞ্জামাদি দিয়ে সহায়তা করল বা মুজাহিদদের দেখাশোনা করল তারা সবাই জিহাদের সাওয়াব পাবে। মোটকথা জিহাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন প্রত্যেকেই জিহাদের সাওয়াব পাবে, চাই তা প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপনে।

যুদ্ধের সরঞ্জামাদি তথা হাতিয়ার, বাহন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় খাতে মাল ব্যয় করা অথবা মুজাহিদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মাল খরচ করা।

অন্য মুজাহিদদের জন্য মাল খরচ করা। অথবা তাকে প্রয়োজনীয় যুদ্ধসামগ্রী দিয়ে সহায়তা করা।

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

অর্থ- আর তোমরা তাকওয়া ও সৎকাজে একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা কর। অপরাধমূলক কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না।
–সূরা মায়েদা :২

সারকথা, প্রত্যেক ধনাঢ্য নারীর উপর জিহাদ বিল মাল ওয়াজিব। ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাল দিয়ে নারীকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে নারীর উপর জিহাদ বিন নফস ওয়াজিব নয়। কিন্তু জিহাদ বিল মাল সর্বাবস্থায় তার উপর ওয়াজিব। মনে রাখতে হবে জিহাদের সাধারণ অর্থে নফস ও মাল নারীর উপর ওয়াজিব।

বক্তৃতা ও জবানের মাধ্যমে নারীর জিহাদ

عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم.

অর্থ- হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের জান, মাল ও যবানের মাধ্যমে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। –আবু দাউদ, ২৫০৬

উল্লিখিত হাদীস তিনভাবে জিহাদের নির্দেশ দিচ্ছে। ভাষাগত জিহাদ তার একটি। বয়ান-বক্তৃতা ও দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। জিহাদ বিল লিসান (ভাষার জিহাদ) বলা হয়, কাফের ও মুশরিকগোষ্ঠীর নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করাকে। এ প্রকারের জিহাদ, জিহাদ বিন নফস ও জিহাদ বিল মাল থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং আক্রমণকারী বাহিনীর কর্তব্য হল তারা আক্রমণ করার পূর্বে জিহাদ বিল লিসান করবে অর্থাৎ মুশরিকদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে। দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করে বোঝানোর চেষ্টা করবে যে, ইসলামই একমাত্র শান্তির ধর্ম। তারা যদি ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে নেয়, তবে তাদের জান ও মালে হস্তক্ষেপ করা মুসলমানদের উপর হারাম হয়ে যাবে।

মুসলিম নারীগণ ভাষাগত জিহাদের অবশ্যই শক্তি রাখে। আল্লাহর দিকে ডাকার এবং ইসলামের শিক্ষা ও শিষ্টাচার, ইসলামী নীতিবিধান বিস্তার এটি একটি সুপ্রশস্ত ময়দান। বিশেষভাবে মহিলা ও শিশু শ্রেণির মাঝে দীন প্রচারে এর বিকল্প নেই।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে বাধা প্রদান জিহাদ বিল লিসানের একটি রূপ। মক্কায় অবতীর্ণ একটি আয়াতে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا

অর্থ- সুতরাং আপনি কাফেরদের অনুসরণ করবেন না। তাদের বিরুদ্ধে কুরআনের সাহায্যে জিহাদ করুন। –সূরা ফুরকান, ৫২

অর্থাৎ জিহাদুল কুফ্ফার বিল কুরআন। কুরআনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে

বড় জিহাদ করুন। আর তা হল নিজের সর্বপ্রচেষ্টা ব্যয় করে কুরআনের সাহায্যে কুরআনের দিকে তাদেরকে ডাকা।

উল্লিখিত আয়াতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তার অর্থ হল নারী-পুরুষ সকলের উপর এই সম্বোধন আরোপিত হবে। ইবনে কাইয়িম বলেন, আল্লাহ তাআলা এই আয়াতের দ্বারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিজরতের পূর্বে মক্কায় হুজ্জত বা প্রতিবাদী জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। আর তখন তাবলিগ ও প্রতিবাদী জিহাদ ছিল। –যাদুল মাআদ ২/৫৫

কুরআনের নীতিমালাকে জাতির সামনে তুলে ধরতে নারীর উপরও এই নির্দেশ আরোপিত হবে। নারী ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষাদানে অংশ নিবে। যোগ্য পুরুষ তৈরি করবে। ইসলামের মহান বাণীকে চারদিকে ছড়িয়ে দিবে। এটাই আমাদের অভিলাষ। বিশেষ করে সমকালীন আধুনিক সংবাদপত্র ও বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে এই কাজটি সম্পাদন সহজেই সম্ভব। একটি সুশীল জাতিগঠনের জন্য ভাষার ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ-কারণেই সূরা আহযাবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনীগণ ও অন্য মুসলিম নারীদের সম্পর্কে বার-বার সতর্ক করা হয়েছে। কেননা বহিঃশক্তি সুদৃঢ়করণ অভ্যন্তরীণ শক্তির উপর নির্ভর করে। বিল্ডিং-এর ভিত্তি যত শক্ত ও মজবুত হবে সেই বিল্ডিং তত বেশি টেকসই ও স্থায়ী হবে। কিন্তু ভিত্তি যদি দুর্বল হয় বাহির দৃশ্য যত চমৎকারই হোক না কেন তা কখনো টেকসই হবে না। সাধারণ ঝড়ো হাওয়া অনায়াসে উড়িয়ে দিতে পারে তার সোনালি প্রাসাদ। তদ্রূপ গোটা মুসলিম জাতির জন্য নারীগণ হচ্ছে ভিত্তিস্বরূপ। নারীদের এই ভিত্তি যত মজবুত হবে জাতি তত শক্তিশালী হবে। এই নারীগণই জন্ম দিয়েছিল সালাহুদ্দীন আইয়ুবী, সুলতান মাহমুদ গজনবী, নুরুদ্দীন জঙ্গি, বখতিয়ার খিলজি, তারিক বিন জিয়াদ, মুহাম্মাদ বিন কাসেমদের মতো ব্যক্তিত্ব। তারা পেটে ধারণ করেছিলেন ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, আবদুল্লাহ ইবন মুবারকদের মতো বিশ্ববিখ্যাত হাদীসবিশারদ। জিহাদ বিল লিসানের আরেক রূপ হল আল্লাহর রাস্তায় কিতালের জন্য লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করা, যা নারীর পক্ষে সম্ভব। উম্মে উমারা, খানাসা, সাফিয়া রাযি.-এর মতো সাহাবাদের দৃষ্টান্ত পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিজের পিতা, ভাই, স্বামী ও পুত্রদের জিহাদের প্রতি কিভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে।

ইসলামী সঙ্গঠনগুলো আরো শক্তিশালী করে তুলবে। প্রয়োজনে জান-মাল সবকিছু বিলিয়ে দেবে ইসলামের জন্য।

নারী ও সামরিক জ্ঞান

ইসলাম স্পষ্ট ভাষায় সর্বসাধারণকে জ্ঞান অর্জনের জন্য নির্দেশ দিয়েছে। উদাত্ত কণ্ঠে ডেকেছে শিক্ষাপ্রাঙ্গণে। ইসলামের সর্বপ্রথম বাক্যই ছিল 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক'। পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমায় সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে আদেশসূচক ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। এরূপ আদেশসূচক বাক্য সাধারণত ওয়াজিব হওয়া বোঝায়।

তাই শিক্ষা অর্জন মানবসম্প্রদায়ের অবশ্য কর্তব্য এবং এটি তাদের মৌলিক অধিকার। বাক্যটি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। তাই মুসলিম সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ সকলের জন্য তা সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

'শিক্ষা' শব্দের বহু অর্থ হতে পারে। অতীত ইতিহাসকে স্মরণ করাও হতে পারে অথবা বর্তমান প্রেক্ষাপটকে জানার জন্যও হতে পারে, বা আচ্ছাদিত জ্ঞান ভাণ্ডার উন্মুক্ত করার অর্থেও এটি ব্যবহার হতে পারে। মোটকথা সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য, গণিত, অর্থনীতি, পৌরনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজকল্যাণ, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, বাগ্মিতা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ইত্যাদি সবকিছুই বোঝাবে। জ্ঞান অর্জনের উপর শরীয়তের নীতিমালাকে ভিত্তি করা হয়েছে। অন্ধ অনুসরণ ও অনুকরণ ইসলাম কখনো শিক্ষা দেয় নি।

তাই শরীয়তের এই মৌলিক বিষয়টির উপর আমল করা প্রত্যেক নারী-পুরুষের ওয়াজিব কর্তব্য। পূর্বেই বলা হয়েছে, 'জ্ঞান' শব্দটি বিশেষ কোনো অর্থের সঙ্গে নির্দিষ্ট নয়। সব ধরনের শিক্ষাকেই জ্ঞান বলা হবে। আর সেখানে সামরিক বিদ্যাও অন্তর্ভুক্ত যা আমাদের আলোচ্যবিষয়। শিক্ষায় নিয়োজিত থাকা ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে অধিক মর্যাদা রাখে, তবে অবশ্যই তা ইসলামের গণ্ডির ভিতরে হতে হবে।

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

অর্থ– আর আপনি বলুন, প্রভু হে, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।

সূরা ত্বোয়া-হা : ১১৪

জ্ঞান বৃদ্ধি ও তা অর্জন করা মানবসম্প্রদায়ের জন্য একটি বড় নিয়ামত।

এই জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ পরকালের পরিচয় লাভ করতে পারে। ইহকালে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পদ্ধতিও অর্জিত হয় এই জ্ঞানের মাধ্যমে। সমাজে জ্ঞানের পরিধি যার যত বেশি সম্মান-মর্যাদাও তার তত বেশি। তবে মানব সম্প্রদায়ের যতটুকু জ্ঞানই অর্জিত হোক না কেন তা খুবই সামান্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, وما أوتيتم من العلم الا قليلا তোমাদের অতি অল্প জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। এজন্য জ্ঞান অর্জন ও তা বৃদ্ধির সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত তা পার্থিব জ্ঞান হোক বা অপার্থিব। এই জ্ঞানের একটি অংশ সামরিক জ্ঞান। মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নতির চাবি-কাঠি এটি। বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে এর মধ্যে।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থ- আপনি বলে দিন, যারা শিক্ষা গ্রহণ করে ও যারা শিক্ষা গ্রহণ করে না তারা কি আদৌ বরাবর হতে পারে? –সূরা যুমার : ৯

জ্ঞানী ও মূর্খের মাঝে যোজন পার্থক্য করে দিয়েছে। মানবজাতি চাই সে নারী হোক বা পুরুষ, একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই ইহকাল ও পরকালের সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে পারে। তদ্রূপ সামরিক জ্ঞান, এক্ষেত্রে আধুনিকতাকে সামনে রেখেই আমাদের এগুতে হবে। প্রাচীনকালের ঢাল-তলোয়ার আজকের এই আধুনিকতম যুগে কোনো কাজে আসবে না। তলোয়ারকে ঠেকাতে ইসলাম তলোয়ার ব্যবহার করেছে। তদ্রূপ আজ অ্যাটোম ও আণবিক ঠেকাতে প্রয়োজন অ্যাটোম ও আণবিক। পারলে এরচেয়ে উন্নত অস্ত্র আবিষ্কার করা। তাই আধুনিক বিভিন্ন শিক্ষার মাধ্যমেই মুসলিম সম্প্রদায় বিজাতির উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করা সময়ের সবচে বড় দাবি। বলা বাহুল্য যে, এ ক্ষেত্রে মুসলিম নারীরাও অংশ নিতে পারে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

অর্থ- তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর- এদ্দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুদের এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না। আল্লাহ তাদের জানেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। –সূরা আনফাল, আয়াত ৬০

এখানে قوة বা শক্তি অর্জনের দ্বারা উদ্দেশ্য নিক্ষেপযন্ত্র বা ক্ষেপণাস্ত্র। শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে ক্ষেপণাস্ত্র আবিষ্কার। আয়াতে সমগ্র মুসলিম জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। শত্রুদেরকে ভীতিপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শক্তি অর্জনের নির্দেশ দিচ্ছেন। তাই এ-ধরনের শক্তি অর্জন করতে হবে যা শত্রুদের অস্ত্রের চেয়েও শক্তিশালী হবে, যা তাদের জন্য ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। শত্রু যখন অ্যাটোম বোমার মহরা শুরু করবে, তখন আমাদের অ্যাটোম তাদের মাথার উপর পড়তে হবে। শত্রু যখন একটি বানাবে তাদের মোকাবেলায় দুটি বানানো উচিত। তখনই দেখতে পাবে স্বাধীনতার গৌরবময় পতাকা। আর তা তখনই সম্ভব যখন নারী পুরুষ নির্বিশেষে এই ঈমানি দায়িত্ব পালনে অংশ নেবে। এ-ব্যাপারে মুফাসসিরীনে কিরামের বর্ণনা অনুযায়ী উল্লিখিত আয়াতে শক্তি অর্জন দ্বারা তলোয়ার, অশ্ব চালনা, ঘোড় দৌড়, তীর নিক্ষেপ ইত্যাদি অস্ত্রের ট্রেনিং নেওয়া যা তখনকার আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। মুফাস্সিরীনে কিরাম বলেন, এগুলোর ট্রেনিং নেওয়া আজও ফরজে কিফায়া।

القوة সম্পর্কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসও রয়েছে। হযরত ওকবা ইবনে আমের রাযি. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি,

وأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّة، ألا إنّ القُوَّة الرَّمْيُ ألا إنّ القُوَّة الرَّمْيُ.

সহীহ মুসলিম-৫০৫৫

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম واعدوا لهم ما استطعتم من قوة এই আয়াতের قوة শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, قوة দ্বারা সাধারণত সব

ধরনের অস্ত্রকেই বোঝানো হয়। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম رمی কে নির্দিষ্ট করে বলেছেন। কেননা رمی বা ক্ষেপণাস্ত্র সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। যেমনটি অন্য হাদীসে পাওয়া যায় الحج العرفة। অর্থাৎ আরাফায় অবস্থান করাই হজ। অথচ শুধু আরাফায় অবস্থান করলেই হজ আদায় হবে না। এখানে আরাফার বিশেষ মর্যাদা বোঝানোর জন্য এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্ষেপণাস্ত্রের গুরুত্ব ও সমর বিভাগে ক্ষেপণাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর জন্য এটি একটি সূক্ষ্ম নির্দেশিকা। যেমনটি আমরা বর্তমান যুগে অনুভব করছি ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়া যুদ্ধই যেন অচল। বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র, ট্যাংক, বিমান, বন্দুক, আণবিক, পারমাণবিক এসবই হাদীসের الرمی তে অন্তর্ভুক্ত।

লক্ষ্যণীয় যে, এ সমস্ত আয়াত বা হাদীসে বিশেষ কোনো লিঙ্গ নির্দেশ করা হয় নি। তাই নারীদের আধুনিক অস্ত্র তথা ট্যাঙ্ক চালনা, বোমা নিক্ষেপ ইত্যাদির প্রশিক্ষণ নেওয়া মোটেই দোষের নয়। বিশেষ মুহূর্তে তা আত্মরক্ষার কাজে অবশ্যই আসবে। অথবা পরিস্থিতি যখন তাদেরও ময়দানে ডাকবে তখন যেন নির্বিশেষ তারাও সাড়া দিতে পারে জিহাদের আহ্বানে। –আলমুফাস্সাল ৪/৪২১

আমাদের এমন লোকজনেরও অভাব নেই যারা প্রশিক্ষণ তো নিয়েছে বটে তবে পরবর্তী সময়ে অবহেলাবশত তা ভুলে গেছে কিংবা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ এ-সম্পর্কে হাদীসে কঠোর হুমকি এসেছে। হযরত ওকবা বিন আমের রাযি. বলেন,

مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَه، فَلَيْسَ مِنَّا.

অর্থ- যে ব্যক্তি রমী তথা তীরন্দাজির প্রশিক্ষণ নিল, এরপর তা ছেড়ে দিল সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। –সহীহ মুসলিম, ৫০৫৮

ইমাম নববী রাযি. বলেন, 'রমী'র প্রশিক্ষণ নিয়ে তা ছেড়ে দেওয়া বা ভুলে যাওয়া মাকরূহে তাহরিমী।

রেওয়ায়েতে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা নারী পুরুষ সকলের জন্য সমানভাবে আরোপিত হবে। অতএব যে কেউ সমরবিদ্যা অর্জন করে ভুলে যাবে সে অবশ্যই গুনাহগার হবে।

আল্লামা শাওকানী থেকে এরূপ উক্তি পাওয়া যায়, যদি কেউ জিহাদের এমন কিছুর প্রশিক্ষণ নিল যা দিয়ে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজে আসে তারপর সে অবহেলা করে তা ছেড়ে দিল বা ভুলে গেল সে বড় অন্যায় করল। আর যে ব্যক্তি জিহাদের নির্দেশকে ছেড়ে দিবে সে দীনের একটি অংশ ছেড়ে দিল।

–নাইলুল আওতার ৮/২৪৭

عن عقبة بن عامر قال: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إِنَّ اللهَ عزوجل يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعَه يَحْتَسِبُ فِيْ صَنعَتِه الْخَيْرَ، الرَّامِي بِه، ومُنَبِّله.

অর্থ- হযরত ওকবা ইবন আমের রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা একটি তীরের অসিলায় তিনজনকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাবেন। যে মহৎ উদ্দেশ্যে তীরটি বানিয়েছিল। তীর শত্রুর প্রতি যে নিক্ষেপ করল। তীরটি যে এগিয়ে দিয়েছে।

–নাসায়ী, ৩৫৭৮

হাদীসটি এ-কথার প্রমাণ বহন করে যে, জিহাদের জন্য অস্ত্র তৈরির কাজ করা। সংস্কার ও মেরামত করা জান্নাতে প্রবেশে মুজাহিদের সমান ভূমিকা রাখে। কিন্তু তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে।

–নাইলুল আওতার ৮/২৩৭

হাদীসটিতে যুদ্ধাস্ত্র তৈরীর গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তার মর্যাদা ততটুকু যতটুকু তার প্রয়োগকারী মুজাহিদের। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যুদ্ধাস্ত্র তৈরীতে নারী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করে আল্লাহর পথের লড়াকু সৈনিকদের সহযোগিতা করবে। এতে করে জিহাদের বিশেষ ফজিলত ঘরে বসেই অর্জন করে নিতে পারে। যে রকম তারা সমকালীন টেকনোলজি শিক্ষা ও শিখানোর ক্ষেত্রে অংশ নিতে পারে। আর এটি নারীদের তবিয়ত বা স্বভাববিরোধী নয়।

ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ, হাদীস বিশারদগণ ক্ষেপণাস্ত্র বিষয়ক যে সমস্ত উক্তি পেশ করেছেন তার সারসংক্ষেপ হল, তা শুধু পুরুষের জন্য নয় বরং নারী-পুরুষ উভয়ের তাতে অংশ নেওয়া উচিত। তারা প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামের প্রথম সারির নারীগণও এ-ধরনের কাজে অংশ নিয়েছিলেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ، فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ، فَسَبَقَنِي، فَقَالَ: «هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ». (سنن أبي داود ٢٥٨٠).

অর্থ- মহিলা সাহাবীদের কিছু অংশ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের যুগে বিশেষ বিশেষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণ তাদের অনুমতি দিয়েছেন। তাদের সঙ্গে শত্রুপক্ষের লড়াইও হয়েছে। এ সমস্ত ঘটনা প্রমাণ করে যে, তারা অবশ্যই প্রথমে অস্ত্রের ট্রেনিং গ্রহণ করেছিল। কেননা ট্রেনিংগ্রহণ ব্যতীত যুদ্ধে বের হওয়া অসম্ভব প্রায়। প্রাথমিক পর্যায়ে নারীর উপর জিহাদ ওয়াজিব নয় বটে, তবে জিহাদি ট্রেনিং নেওয়া অবশ্যই ওয়াজিব।

উলামায়ে কিরামের একটি সূত্র রয়েছে ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب যা ছাড়া ওয়াজিব আদায় করা যায় না তাও ওয়াজিব।

আমরা জানি যে, দীনের নীতিমালা সংরক্ষণ করা ওয়াজিব এবং দেশের প্রতিরক্ষাও ওয়াজিব। আর যুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ট্রেনিং ব্যতীত এবং শত্রুর মোকাবেলা ব্যতীত এই ওয়াজিব কখনো পুরা করা সম্ভব হবে না। অতএব মুসলিম উম্মাহর উপর জিহাদ যখন ফরজ হবে, তখন তার প্রশিক্ষণও ফরজ হবে। আর কিতাল যেহেতু বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে নারীর উপরও ফরজ হয়ে যায় তাই সাধ্য অনুযায়ী সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা নারীর উপর ওয়াজিব হবে। কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী বর্তমান মুসলমানদের উপর আধুনিক অস্ত্রের ট্রেনিং ও তার ব্যবস্থাগ্রহণ করা ফরজ।

জিহাদের জন্য নারীর অনুমতি গ্রহণ

জিহাদের জন্য নারীর অনুমতি নেওয়ার পূর্বশর্ত কী? জিহাদে যেতে স্বামীর জন্য কি স্ত্রীর অনুমতি প্রয়োজন? জিহাদের জন্য শরঈ অলী বা স্বামী অথবা ইমাম বা সহকারী ইমামের অনুমতি কি প্রয়োজন?

নারীর জিহাদে গমন সংক্রান্ত যে সমস্ত হাদীস ও রিওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, সেখানে লক্ষ্যণীয় যে, তাঁরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

স্পষ্ট অনুমতি সাপেক্ষে জিহাদে বের হয়েছিলেন। অথবা তাঁরা তাঁদের স্বামী বা মাহরামের সঙ্গে গিয়েছিলেন। এ-দ্বারা প্রমাণিত হয় ফরজে কিফায়া জিহাদে নারীকে অনুমতি সাপেক্ষে বের হতে হবে।

আল্লামা শারবানী রহ. বলেন, শরঈ ইমামের অনুমতি ব্যতীত জিহাদ করা মাকরূহ।

বাহাউদ্দীন মাকদিসী বলেন, আমির ব্যতীত জিহাদই জায়েজ নেই। কেননা যুদ্ধের উপকারিতা ইত্যাদি সম্পর্কে নেতাই অধিক জ্ঞাত। তবে যদি শত্রুবাহিনী অতর্কিত হামলা করে বসে এমতাবস্থায় আমিরের কোনো প্রয়োজন নেই। الروض المربع ١/١٧٧

ফরজে কিফায়া জিহাদে স্ত্রীকে স্বামীর অনুমতি নিয়ে বের হতে হবে। কেননা স্বামীর নির্দেশ মান্য করা ও তার খেদমত করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব। আর ফরজে কিফায়া জিহাদে বের হওয়া মোবাহ্। তাই কখনো ওয়াজিব মোবাহ্র উপর প্রাধান্য পাবে না।

যখন জিহাদের সাধারণ ঘোষণা এসে যাবে, তখন কারোর অনুমতির প্রয়োজন নেই। স্ত্রী তার স্বামীর ও পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত সন্তানদের জিহাদে বের হতে হবে। কেননা জিহাদ তখন সর্বসাধারণের উপর ফরজে আইন হয়ে যাবে। নারী-পুরুষ সকলের উপর হুকুম বরাবর হয়ে যাবে। তাই বিবাহিত নারী তার স্বামীর নির্দেশ উপেক্ষা করে, অবিবাহিত নারী অভিভাবকের নির্দেশ উপেক্ষা করেই জিহাদের ডাকে সাড়া দিবে। কেননা শত্রুগোষ্ঠী থেকে মাতৃভূমি রক্ষা করা, জাতীয় মান-সম্মান অটুট রাখা ও ইসলামী মানচিত্র টিকিয়ে রাখা নারী-পুরুষ সকলের উপর ফরজে আইন। এ ব্যাপারে ইবনে হাজমের উক্তিও অভিন্ন। তিনি বলেন, পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদে বের হওয়া যায়েজ নেই। তবে শত্রুবাহিনী যদি কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে আক্রমণ করে বসে তাহলে তাদের উদ্ধারের লক্ষ্যে সাহায্য করা সকলের উপর ফরজে আইন। তবে যদি তার জিহাদে গমনের কারণে পিতা-মাতার মৃত্যুর আশঙ্কা হয়, তাহলে তাদের ছেড়ে যাওয়া যায়েজ নেই।

المحلى ٥/٣٤١

কিতালের জন্য বিশেষ বাহিনী সর্বদা প্রস্তুত রাখা এবং পার্শ্ববর্তী ও দূরবর্তী শত্রু-ভূখণ্ডে হামলা করা ফরজে কিফায়া, যা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানকে

অবশ্যই আদায় করতে হবে। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান যদি এ দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, এ ধরনের বিশেষ বাহিনী গঠন না করে, তাহলে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পালনার্থে এ ধরনের বাহিনী তৈরি করা নারী-পুরুষসহ গোটা মুসলিম জাতির উপর ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থ- ক্ষুদ্র ও বড় দলে বিভক্ত হয়ে তোমরা বেরিয়ে পড় এবং তোমাদের জান ও মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। –সূরা তাওবা : ৪১

এ ব্যাপারে ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ার উক্তি, পুরুষ যদি পিতা-মাতার বর্তমানে জিহাদে বের হতে চায়, তা হলে তাদের অনুমতি ছাড়া বের হওয়া উচিত হবে না। তবে জিহাদের সাধারণ ডাক এসে গেলে পিতা-মাতা, কিংবা দুজনের একজন যদি তাকে অনুমতি দেয় কিন্তু অপরজন নিষেধ করে, তাহলে এমতাবস্থায় তার অধিকারের দিকে লক্ষ রেখে জিহাদে বের হওয়া উচিত হবে না। তবে পিতা-মাতা ছাড়া অন্য কোনো মাহরাম, যেমন, ছেলে-মেয়ে, বোন-ভাই, খালা-ফুপু ইত্যাদি যদি তার জিহাদে যাওয়া পছন্দ না করে, জিহাদে গমনেচ্ছু ব্যক্তিও যদি তাদের সঙ্কীর্ণতার ভয় করে। কেননা তাদের যাবতীয় ভরণ-পোষণ সে-ই বহন করে এবং তাদের কোনো ধন-সম্পদও নেই যা দিয়ে তারা চলতে সক্ষম, তারা প্রাপ্তবয়স্ক হোক বা না হোক, তাদের বিবাহ হয় নি, অথবা তারা সবাই বড় তবে এসব ক্ষেত্রে তাদের সাধারণভাবে জিহাদে বের হওয়া জায়েজ হবে না। –ফতুয়ায়ে হিন্দিয়া ১৮৯/২

আর যদি তারা সবাই বিবাহিত হয় এবং তাদের স্বামীগণ তাদের সমস্ত ভরণ-পোষণ বহন করে অথবা তারা অপ্রাপ্তবয়স্ক হয়, তবে সকলেই যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক এবং সে জিহাদে বের হলে তাদের কোনো সমস্যা হবে না এমতাবস্থায় তাদের অনুমতির প্রয়োজন নেই। তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ আছে যে, ওমর ইবনে খাত্তাব রাযি. একবার কয়েকজন মহিলার নিকট স্বামীর অনুপস্থিতি কতদিন পর্যন্ত সহ্য করা যায়, এ মর্মে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বিবরণ দিল ২ মাস ধৈর্যের সীমা, কমপক্ষে ৩ মাস এবং চূড়ান্ত সময়সীমা চার মাস। এ পর্যন্ত আত্মসংবরণ করা যায়। এর বেশি ধৈর্যধারণ করা অসম্ভবপ্রায়। অতএব ওমর রাযি. সেনাসদস্যদের স্ত্রীদের থেকে

অনুপস্থিতির সময়সীমা ৩ মাস নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ৩ মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে তাকে ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদের স্থানে নতুন সৈনিক অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

কিন্তু মুজাহিদ বা সীমান্ত প্রহরী যদি অনেক দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করে, পরিস্থিতি এমন হয় যে, তার ফিরে আসা মুসলমানদের ধ্বংস বা পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এমতাবস্থায় অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই তাকে অবস্থান করতে হবে।

মুসলিম বন্দিনী

কাফেরগোষ্ঠীর হাতে যদি কোনো মুসলিম নারী আটক হয়ে থাকে তাদের অপমানজনক বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করা গোটা মুসলিমজাতির উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা কাফেরগোষ্ঠীর হাতে মুসলিম নারীর জীবন-মাল চরম বিপদসঙ্কুল এবং অবশ্যই তা জাতির জন্য কলঙ্কজনক। ইসলামের বিধান হল- মুসলিম সে পুরুষ হোক বা নারী, যদি কাফেরদের হাতে বন্দি হয়ে যায়, তাকে উদ্ধার করা সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব। এমতাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সাধারণ ঘোষণা দেওয়া হবে। হাদীস শরীফে আছে,

عَنْ اَبِيْ مُوْسى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ: فُكُّوْا الْعَانِيَ يَعْنِيْ الْأَسِيْرَ وَاَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَعُوْدُوْا الْمَرِيْضَ.

অর্থ- দুঃস্থ বা বন্দিদের মুক্ত কর। ক্ষুধার্তদের অন্ন দাও ও পীড়িতদের শুশ্রূষা কর।
–সহীহ বুখারী, ৩০৪৬

ফাতহুল বারিতে এসেছে, সুফিয়ান সাওরী বলেন, العانى الأسير অর্থাৎ হাদীসে বর্ণিত 'আনী'র অর্থ বন্দি। আল্লামা ইবনে বাত্তাল বলেন, মুসলিমবন্দিকে মুক্ত করা ওয়াজিব আলাল কিফায়া। অর্থাৎ যদি কিছু সংখ্যক লোকও তাদের উদ্ধারকাজে এগিয়ে না আসে তবে সকলে ওয়াজিব তরকের কারণে গুনাহগার হবে। যে করেই হোক তাদের উদ্ধার করতে হবে। মাল দিয়ে হোক বা বন্দিবিনিময়ের মাধ্যমে হোক কিংবা লড়াইয়ের মাধ্যমেই হোক না কেন।
–ফাতহুল বারী ৬৬/১৮৬ (بَاب فكاك الأسير)

নারীর শাহাদাত

নারী যদি যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা যুদ্ধের কারণে কতল হয় তা হলে সে শহীদ। শহীদের পূর্ণ সাওয়াব তার অর্জিত হবে। একজন পুরুষ শহীদের সঙ্গে যেরূপ আচরণ করা হয় তার সঙ্গেও সেরূপ আচরণ করা হবে। শহীদের বিধান ও মর্যাদা সম্পর্কিত সমস্ত আয়াত ও হাদীস নারীপুরুষ সকলের জন্য প্রযোজ্য। তবে নাপাক অবস্থায় নারী শহীদের গোসল সম্পর্কে কিছু মাজহাবী মতানৈক্য রয়েছে যা নিম্নে তুলে ধরা হল।

হানাফী মাযহাব অনুসারে, শহীদ ওই ব্যক্তিকে বলা হবে কাফেরেরা যাকে কতল করবে অথবা যুদ্ধের ময়দানে নিহত অবস্থায় পাওয়া যাবে এবং তার শরীরে জখমের প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য চিহ্ন পাওয়া যাবে।

কেন স্বামীদের জিহাদে যেতে উদ্বুদ্ধ করব

মুমিন নারীর উচিত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করা এবং স্বামীদেরকে নেক কাজে উৎসাহিত করা। যখন তাকে আল্লাহর পথে ডাকা হয়, তখন কোমল কণ্ঠে উদ্বুদ্ধ করা, তাকে তাগিদ দেওয়া। কেননা আল্লাহ তাআলা আমাদের তাকদিরে সবকিছু পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাই আমাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে পেরেশান হওয়ার কোনও কারণ নেই। এতে তারা সজাগ হবে। এটা কি আমাদের জন্য গর্বের বিষয় নয় যে, আমাদের স্বামী একজন শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে? তারচেয়ে বড় কথা; আমরা কি জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি পেতে চাই না?

এই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সময়ে মুসলিম উম্মাহ খুব বেশি দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় আমাদের শত্রুকর্তৃক নিক্ষিপ্ত ইউরেনিয়ামের কারণে ইরাকী উম্মাহ ক্যান্সারে মারা যাচ্ছে। সে দেশে ক্যান্সার দশগুণ হারে বাড়ছে। মুমূর্ষু রোগীর রোগ নিরাময়ের জন্য ব্রিটেন-আমেরিকা কর্তৃক আরোপিত অবরোধের কারণে প্রয়োজনীয় অষুধ সেখানে অপ্রতুল। অবরোধের কারণে এক মিলিয়নেরও বেশি লোক, যার অর্ধেক নিষ্পাপ শিশু, অপুষ্টি ও এতৎসংক্রান্ত রোগে মারা গেছে। এই নীরব মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ নেই। প্রতি ছয় মিনিটে সে দেশে একজন শিশু মারা যাচ্ছে। আর এর জন্য আমরা অবশ্যই আল্লাহ তাআলার দরবারে জিজ্ঞাসিত হব যে, আমরা আমাদের ভাই-বোনদের সাহায্যে কী করেছি? শুধু আমাদের জন্য যদি তারা এ রকম বীভৎস

পথে মারা যায়, তাহলে কি আমরা আমাদের উম্মাহর এ ধরনের উদাসীনতার জন্য আক্ষেপ করব না? তাহলে আমাদের কি উচিত নয়, আমরা নিজেদের যেভাবে ভালোবাসি সেভাবে ঐসব ভাই-বোনকে ভালোবাসা?

যখন নব্য ক্রুসেডাররা আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশ করল তখন তারা নির্বিচারে তাদের উপর ক্লাস্টার বোমা নিক্ষেপ করল। আর সমগ্রউম্মাহ তা তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল। তথাকথিত এই ভয়ঙ্কর বোমার ক্ষমতা সম্পর্কে ১৫ বছরের একটি বালক তার দেখা একটি ঘটনা বর্ণনা করেছে এভাবে,

সেদিন ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল। আমার আম্মা সবেমাত্র দুপুরের খানার জন্য ডাকছিলেন। পরবর্তী যে শব্দ আমার কানে এল, তা হল আকাশে শত্রুর বিমান আক্রমণের শব্দ। আমি তাড়াতাড়ি গোপন আশ্রয়ে প্রবেশ করলাম। কিন্তু আমি যখন বের হয়ে এলাম, দেখলাম, আমার আম্মা-আব্বা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। আমার ছোট্ট বোনের শরীরে লোহার টুকরো আঘাত করেছে। তার হাতের খেলনাটিও এর থেকে রেহাই পায় নি। আমাদের পথ-ঘাট গর্ত হয়ে গিয়েছে। বিস্ফোরিত ক্লাস্টার বোমা ছোট্ট-ছোট্ট লৌহশলাকার মতো ছিটানো রয়েছে।

এ টুকরোগুলো যেসব ছেলেমেয়ের শরীরে প্রবেশ করে দীর্ঘদিন তার শরীরের ভিতরে এগুলোর দংশন অব্যাহত থাকে। ফলে তার দেহের ভিতরে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে, যার কারণে সে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুবরণ করে।

সুতরাং আমাদের স্বামীদের আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা উচিত। তাহলে হয়তো এ রকম ঘটনার মুখোমুখি হওয়া থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারব। আমেরিকার ঘটনায় প্রমাণিত হয় পরিস্থিতি কত দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। আমরা কি জানি না যে, আমাদের মৃত্যুর সময় আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা অনেক পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। যখন আমরা মাতৃগর্ভে ছিলাম, তখনই তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তাহলে কেন আমরা আমাদের স্বামীদের হারানোর ভয়ে ভীত হব? যদি তাদের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়, তাহলে তারা যে কোনোভাবেই হোক মারা যাবে। যদিও তারা জিহাদ থেকে দূরে থাকে। আমাদের স্বামীরা মারা গেলে কি আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতিপালন করবেন না।

সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে আছে-

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، أَنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ.

অর্থ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. রিওয়ায়েত করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি সমগ্র সৃষ্টিকূলের মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী এবং যাঁর সত্যবাদিতা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য, তিনি বলেন, মানুষের বীর্য চল্লিশ দিন গর্ভাশয়ে সঞ্চিত থাকে। চল্লিশ দিন পর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরো চল্লিশ দিন পর তা মাংসপিণ্ডে রূপ নেয়। তারপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একজন ফিরিশতা প্রেরিত হয়। এ সময়ই তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেন। ১. তার বয়স কত হবে। ২. সে কী পরিমাণ রিজিক পাবে। ৩. সে কী কী কাজ করবে। ৪. তার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য হওয়ার বিষয়। অতঃপর তার মাঝে রূহ ফুঁকে দেন। –সহীহ বুখারী, ৭৪৫৪

সুতরাং আল্লাহ তায়লার প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করতে হবে। তাঁর ফায়সালাকে সবর ও বিনয়ের সঙ্গে কবুল করতে হবে। আমরা মেয়েরা যদি আমাদের স্বামীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে জিহাদে পাঠাই তাহলে তো তাদেরকে হারাচ্ছি না বরং হয়তো তাদেরকে শহীদ হিসেবে পাব, অন্যথায় আমরাও সন্ত্রাসীদের সহজ শিকারে পরিণত হব। সেদিন তারা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। শেষ বিচারের দিন একজন শহীদ তার পরিবারের সত্তরজনের জন্য শাফায়াত করতে পারবে। আল্লাহ তাআলা এই সত্তরজনের জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। আর আমরা তো এ-কথা জানি, যদি আমরা আমাদের স্বামীদের জিহাদের ব্যাপারে উৎসাহিত করি, তাহলে নিজেরা জিহাদ করার সমান সাওয়াব পাব?

ফিলিস্তিনে আমাদের ভাইয়েরা জুলুম নির্যাতন আর হত্যার বেড়াজালে বন্দি। এ জঘন্য হত্যাকাণ্ড ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে চলছে। আর এ অবস্থায়ও মুসলমানদের বলতে শোনা যাচ্ছে, আল্লাহ তাআলা যুদ্ধ করার জন্য

ফিরিশতা পাঠাবেন। অথচ এটা একদম ভিত্তিহীন কথা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেই যুদ্ধের আদেশ করেছেন। যখন আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব শুধু তখনই আল্লাহ তাআলা আমাদের সাহায্যে ফিরিশতা পাঠাবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যুদ্ধ করতে আসবেন না। বরং আমাদের উচিত তাঁর হুকুম পালন করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

অর্থ- আল্লাহ তাআলা কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। —সূরা রাদ : ১১

একজন পুরুষকে তার স্ত্রীর তুলনায় অন্য কেউ বেশি উৎসাহ দিতে পারে না, যা অনেক সময় সে নিজেও উপলব্ধি করতে পারে না। আমরা আমাদের স্বামী ও অন্যদের জন্য মঙ্গলের কারণ হতে পারি, নয়তো কারণ হতে পারি দুঃখ-দুর্দশার।

যুগে-যুগে মুসলিম নারীগণ তাদের রক্ত সিঞ্চন করে ইসলামী বাগিচাকে প্রস্ফুটিত করে রেখেছে। ইতিহাসে তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে। দিশারিরূপে কিয়ামত পর্যন্ত তা আগত মা-বোনদের পথ দেখাবে। ইসলামের এই দুর্দিনে প্রয়োজন প্রত্যেক নর-নারীর বুকের তাজা রক্ত। উম্মে হারাম, উম্মে সুলাইত, সুমাইয়াসহ ইতিহাসের গৌরবময় সেই কালজয়ী মর্দে মুজাহিদদের জানিয়ে দিতে হবে যে, আমরা আপনাদের রেখে যাওয়া ইসলামের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করতে বিলিয়ে দেব আমাদের সবার প্রাণ। তাদের প্রতি ফোঁটা রক্তের বিনিময়ে আমাদের এক-একটি জান উৎসর্গ করে দেব আল্লাহর পথে।

নারীর ভাষার জিহাদ

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে মুমিনগণের কর্ম-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন,

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

অর্থ- মুমিনগণ একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকর্মের আদেশ করে, অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করে, নামায আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের আনুগত্য করে। –সূরা তাওবা : ৭১

নারী-পুরুষের পরস্পর সম্পর্ক, ঈমানি দায়িত্ব ও জীবন বৈশিষ্ট্যের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিধৃত হয়েছে এই আয়াতে। বর্ণনাভঙ্গি যেমন সাবলীল, ভাষাও তেমন সরল ও প্রাঞ্জল। নারী-পুরুষ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল, পরস্পর বন্ধু। জীবনের এই ক্ষণস্থায়ী ঠিকানা পৃথিবীকে বন্ধুত্ব বিশ্বস্ততায় গড়ে তুলতে হলে প্রধানত যে কাজটি করতে হবে তা হল, ভালোকে ভালো আর মন্দকে মন্দ হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। তারপর সাধ্যমতো চারপাশকে গড়ে তুলতে হবে সেই বিশ্বাসের আলোয়। গড়া ও নির্মাণের এই মহতি প্রাঙ্গণে নর নারীর বন্ধু। যেভাবে সংসারে তারা জীবনবন্ধু, বন্ধুত্বের বিস্তীর্ণ ভুবনে পরস্পরে পাশাপাশি থাকবে, নামায-রোযা, হজ-যাকাত, খোদাভীতি ও নবীপ্রেমে ক্রমাগত এগিয়ে যাবে ফুলছন্দে। পাপকে পাপ, পুণ্যকে পুণ্য বলার ক্ষেত্রেও তারা সরে দাঁড়াবে না। পৃথক হবে না ঈমানি ঐতিহ্যের উজ্জ্বলতার আসন থেকে। পাক কুরআনে এ কথাই বলা হয়েছে। সত্যের প্রচার ও জয়ের উপরই যেহেতু পৃথিবীবাসীর শান্তি-শৃঙ্খলার অস্তিত্ব নির্ভরশীল, তাই সত্যনিষ্ঠ করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হতে হবে। অন্যায়-অপরাধ হল সভ্যতার গায়ে এক জঘন্য ঘা। পৃথিবীর উর্বর কোমল বদনে পাপ হল এক ভয়ানক ক্যান্সার, যার শেষ পরিণতি অধঃপতন, ধ্বংস। তাই পৃথিবীর পিঠে থাকতে হলে সুস্থ-সুন্দর সবল পৃথিবীর আশা করলে, পৃথিবীকে মিথ্যা, অপরাধ ও অন্যায় থেকে মুক্ত রাখতে হবে। পাপ পুরুষও করে, নারীও করে। দুয়ে মিলেও করে। পাপের আয়োজন পুরুষ করে, নারী তাতে ঘি দেয়। আবার নারী থাকে আয়োজনে, পুরুষ সঙ্গে তাল মেলায়।

প্রতিদিন বিভিন্ন দেশের এই অভিন্ন বাস্তবতা এ কথাই বলে, সত্যের মুখাপেক্ষী যেমন পুরুষ, তেমন নারীও। বিশ্বময় অথৈ পাপের লোনা দরিয়ায় ভাসছে নর, ভাসছে নারী।

মানুষের অভিজ্ঞতার একটি বড় অর্জন হল কাউকে কোনো বিষয়ে দাওয়াত দিতে হলে প্রথমে তাকে বুঝতে হবে। মেজাজ, রুচি, সখ, স্বভাব, যোগ্যতা ও আকর্ষণকে সামনে রেখে যোগ্যতার যুক্তিতে কথা বলতে হয়। তবেই সে সহজে বুঝে আগ্রহী হয়, ঝুঁকে পড়ে এবং বশ মানে। নারী-পুরুষের

পছন্দের পার্থক্য, রুচি, চিন্তা ও আগ্রহের ব্যবধান আর যোগ্যতার ফারাক কত বিশাল ও গভীর তা নাকি এখনো মনোবিজ্ঞানীরা স্পর্শ করতে পারে নি। হিমালয় জয় করা সহজ, নারীর মনের দুয়ার খোলা সহজ নয়। তবে এও সত্য যে, হাজার বছরের সাধনায় যে নারীর মনের কথা জানতে পারে নি, একই মেরুর আরেক রমণী অনায়াসে চোখের তারায় দিব্যি পড়ে যান সেই রমণীর দুর্ভেধ্য অন্তরের লেখা, সাধের গুপ্ত লিপিকা।

আর এ কারণেই নর যখন নরের দুয়ারে দাঁড়াবে অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার পায়ে ভর করে, নারীও তখন অন্য নারীকে আলোর পথে আহ্বান করবে। দিবসব্যাপী দুর্দান্ত প্রতাপের সঙ্গে সমাজে নেতৃত্ব দিয়ে অলস শরীরে ঘরে ফিরে পুরুষ নারীর কোমল পরশে এসে কি মোমের মতো গলে যায় না? সত্য কথা এই যে, পুরুষের সামনে যে কথা বলতে পারি নি, সেই জরুরি সত্য কথাটি তো জীবনসঙ্গিনীকেই বলতে হবে। ছেলেমেয়েদের সামনে খেলার পুতুলের মতো নুইয়ে পড়েন যে মান্যবর পিতা তাকে নামাযের কথা, রোযার কথা, সময় থাকতে হজের কথা তো আদরের দুলালিকেই বলতে হয়। পর তো পরই, স্ত্রীর কথায় জ্বলে ওঠে এমন অনেকেইও তো বোনের কাছে যেন কাঁচের পুতুল। ধনবান এই ভাইকে তো বোনই বলতে পারে, যদি হজ না করেন তাহলে আমাকে আর নিতে আসবেন না।

জগতে একজন পুরুষের আত্মীয়তার যতো দিক আছে ঠিক ততটি ক্ষেত্রই ছড়িয়ে আছে নারীর আত্মীয়তার। একজন পুরুষের যেমন ভাই থাকে, বোন থাকে, মা-বাবা থাকে, থাকে সন্তানসন্ততি ও শ্বশুড়ালয়ের আত্মীয়স্বজনেরা।

তাই যাদের সঙ্গে রক্তের বন্ধন আছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে, মমতা, হৃদ্যতা ও শুভ কামনার প্রেরণা আছে, প্রাণের টানেই তো তাকে তার উভয় জাহানের কল্যাণ ও সাফল্যের কথা বলতে হবে। এই তো দাওয়াত, ভাষার জিহাদ।

তাই একজন চিন্তাশীল দরদি নারী চাইলে তার পুরো সংসারটাকেই শিল্পীর তুলিতে আঁকা একটি দাওয়াতপত্রে রূপান্তরিত করতে পারেন। যে হাত দিয়ে এতোদিন নারীর হৃদয়জাত সৌকর্য মিলিয়ে এঁকেছে ব্যাঙের ছবি, মানুষের বিকৃত মুখ, সবটুকু মাধুর্য ঢেলে দিয়ে সে চাইলেই আঁকতে পারে বিচিত্র রঙের নন্দিত শিল্পে সারাজাহানের পালনেওয়ালার নাম– আল্লাহ।

যে পাপের তাপে জ্বলছে সমাজ, দেশ, মানুষ, সে পাপের রগরগা বিবরণে

ঠাসা কলঙ্কিত উপন্যাস দিয়ে সাজানো হয়েছে 'রিডিং রুম'। তাতে যে বসবে হাত বাড়িয়ে তুলে নেবে 'পাপগ্রন্থ'। সর্বনাশা এই আয়োজন তো নারী বদলাতে পারে। সাজাতে পারে খোদার কালাম, কালামের দেশী বিদেশী তাফসির, নবীর বাণী-ব্যাখ্যাসহ বহুখণ্ডে প্রকাশিত হাদীসগ্রন্থ দিয়ে; নবী-রাসুলের জীবন শিক্ষা, আউলিয়া কিরামের সোনালি ইতিহাস, মানবজীবনের স্বার্থক দিক-নির্দেশনা দিয়ে ইসলামী আইন দর্শন আদর্শভিত্তিক গ্রন্থাবলী দিয়ে একটি পরিচ্ছন্ন পাঠাগার সাজাতে।

একজন আদর্শ নারী চাইলেই তার সন্তানকে ইসলামী শিষ্টাচার বিধৌত আচরণ, বিনীত কথাবার্তা, মার্জিত জীবনবোধের অপার্থিব রসে গড়ে তুলতে পারে সুন্দর করে। সরল সুন্দর দীনী লেবাসে সাজিয়ে সপ্তাহের সেরা দিনটিতে স্বামী-সন্তান যখন মসজিদে পাঠাবেন তখন পিতা-পুত্রের এই শিল্পসুন্দর দীনী পোশাক, কারুকার্যময় জায়নামায, মূল্যবান তাসবিহ, আনতদৃষ্টি, বিনম্র পথ চলা নিশ্চয় স্বচ্ছ হৃদয়ের যে কোনো দর্শককে আলোড়িত করবে, ভিতরে শক্ত করে নাড়া দেবে। ভাবিয়ে তুলবে আমি কি এমন হতে পারি না এবং আমার সন্তান।

নবীর যুগে নারী সাহাবীগণ আমাদের নারীদের জন্য রেখে গেছেন উত্তম দৃষ্টান্ত, উত্তম আদর্শ। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, এসব বীর নারীর সাহসী জীবনকথা আমরা ভুলে গিয়েছি।

সমাপ্ত

রাহনুমা প্রকাশিত কিছু গ্রন্থ-

⇨ **তারবিয়াতুস সালিক (১ম ও ২য় খণ্ড)**
মূল ঃ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. অনুবাদ ঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান

⇨ **সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন (১ম খণ্ড)**
মূল ঃ ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা, অনুবাদ ঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান

⇨ **তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন (১ম, ২য় খণ্ড এবং সব খণ্ড একত্রে)**
মূল ঃ ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা, অনুবাদ ঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান

⇨ **আল্লাহুর পরিচয়**
মূল ঃ মাওলানা তারিক জামিল, অনুবাদ ঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান

অসাধারণ তাবলিগী সফরনামা

⇨ **ইয়েমেনে এক শ বিশদিন**
প্রফেসর দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম

⇨ **প্রিয় নবীর হাতে গড়া সাহাবায়ে কেরাম (কিশোর সিরিজ-১)**
প্রফেসর দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম

⇨ **কুরআন প্রেমিকদের অমর কাহিনী**
লেখক ঃ মুহাম্মাদ মুয়াজ্জম হুসাইন ফারূকী

⇨ **হাদীসের প্রামাণ্যতা**
মূল ঃ বিচারপতি আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ তাকি উসমানি, অনুবাদ ঃ মুফতী মুহিউদ্দীন কাসেমী

⇨ **সমাজ সংশোধনের দিক-নির্দেশনা**
মূল ঃ বিচারপতি আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ তাকি উসমানি, অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম

⇨ **প্রচলিত ভুল**
লেখক ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক, আমীনুত তা'লীম, মারকাযুদ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা

⇨ **ঈমান সবার আগে**
লেখক ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক, আমীনুত তা'লীম, মারকাযুদ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা

⇨ **সালাম, মুসাফাহা ও অনুমতি প্রার্থনা**
মূল ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন দোস্ত সাহেব, অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান রহমতী

⇨ **বক্তৃতার ডায়েরী**
মাওলানা আবদুল গাফফার শাহপুরী

⇨ **পুঁজি কম লাভ বেশি**
মুফতী মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

⇨ **বাইবেলই বলে খৃস্টবাদ একটি বাতিল ধর্ম**
মুরতাহিন বিল্লাহ জাহির ফায়দী

⇨ **কাদিয়ানিরা অমুসলিম কেন?**
মূল ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মানযুর নুমানী রহ.

⇨ **প্রিয় নবীর দিন রাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)**
মূল ঃ মাওলানা সা'দ হাসান ইউসুফী, অনুবাদ ঃ মুফতী মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

⇨ **দৈনন্দিন জীবনে প্রিয় নবীর সুন্নাতসমূহ**
মূল ঃ মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহ.

⇨ **ইসলামের পরিচয়**
মূল ঃ সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ., অনুবাদ ঃ মাওলানা হাবীবুর রহমান নদভী

⇨ **দাওয়াত ও তাবলীগ : উসূল ও আদাব**
মূল ঃ মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী, অনুবাদ ঃ মুফতী হেদায়াতুল্লাহ

⇨ **বুদ্ধির গল্প**
মাওলানা শামীম আহমাদ

⇨ **ইসলামে জীবিকার নিরাপত্তা**
মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
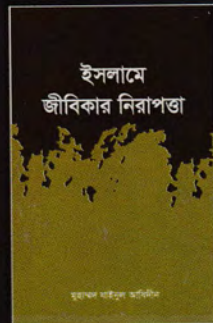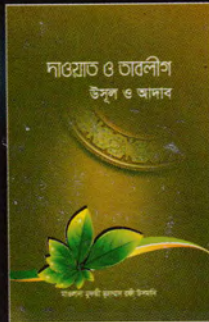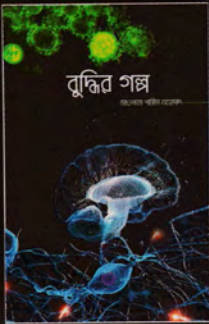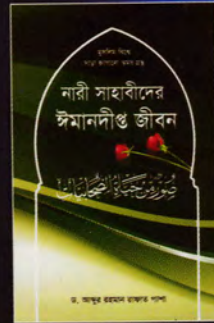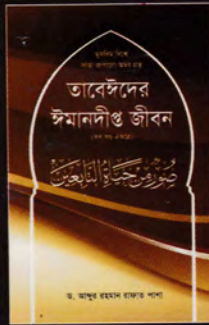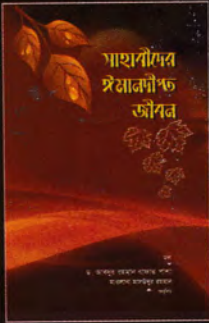
রাহনুমা প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত
কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™
ইসলামী টাওয়ার, দোকান ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।